চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস : আদিবাসী সম্প্রদায়ের আর্থ-জীবন – অভিঘাত ও পালাবদল

প্রাক্-ব্রিটিশ সময়পর্ব থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের আদিবাসী জীবনকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে তাদের জীবনের সঙ্গে লগ্ন থাকা শোষণের বা বঞ্চনার ধারণা মূলত আর্থিক। এই বিস্তৃত সময়পর্বে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নানাবিধ পরিবর্তন ঘটেছে। সেই বিবর্তনের মূল সময়কে মূলত তিনটে পর্যায়ে দেখা যেতে পারে- প্রাক্-ব্রিটিশসময়কাল থেকে ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিক পর্যন্ত, তার পরবর্তী সময় থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত এবং স্বাধীনতা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। প্রথমপর্বে আদিবাসীরা মূলস্রোতের সমাজব্যবস্থা থেকে দূরে বা সীমাবদ্ধ আর্থিক সম্পর্ক বজায় রেখে জঙ্গলে বা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছোটো ছোটো গ্রামে চাষাবাদ, পশুপালন বা জঙ্গল নির্ভর নিজস্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ শাসক প্রণীত "চিরস্থায়ী ব্যবস্থা" তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রথম আঘাত নিয়ে আসে। ব্রিটিশ প্রশাসকের এই ব্যবস্থা যেমন তাদের বন কেটে তৈরি করা জমি থেকে উৎখাত করে, তেমনই তাদের জীবনে সুদখোর মহাজনদের অনুপ্রবেশ ঘটায়। এছাড়াও ব্রিটিশ সরকারের "অরণ্য আইন" আদিবাসীদের জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নেয়। খনির আবিষ্কার, শিল্পের প্রসার, কারখানার পত্তন, রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি কৃষিজীবী ও অরণ্যনির্ভর জনগোষ্ঠীকে মজুরে পরিণত করে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে অবশ্য সরকারি নীতিতে আদিবাসীরা তাদের জমির অধিকার (সংবিধানের পঞ্চম তপশিল অনুযায়ী আদিবাসী জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত), অরণ্যের অধিকার (তপশিলি উপজাতি ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী অরণ্যবাসী আইন, ২০০৬) ফিরে পায়। কিন্তু শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও বিশ্বায়নের ফলে তাদের জমি থেকে উৎখাত হওয়া বা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এখনও অব্যাহত। অন্যদিকে, সংবিধানে শিক্ষা, চাকুরি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কারণেও পেশাগত পরিবর্তন ঘটছে যা তাদের অর্থনৈতিক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। আদিবাসী গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বিভিন্ন সময়ে তাদের আর্থিক কাঠামোর ওপর বহিরাগত

আঘাত বা সময়ের নিয়ম মেনে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বা আর্থ-সামাজিক স্থিতাবস্থা ভেঙে যাওয়া বেশ কিছু বাংলা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। আদিবাসীগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের বাস্তবচিত্র- যা এই উপন্যাসগুলোতে ধরা পড়ল, তাকে বোঝার চেষ্টা আছে এই অধ্যায়ে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *আরণ্যক* উপন্যাসে অরণ্য ও অরণ্যনির্ভর আদিবাসী জীবনের ওপর নেমে আসা বিপর্যয়ের আশঙ্কাকে ব্যক্ত করেছিলেন। অরণ্যভূমিকে নষ্ট করার অনুতাপ বুকে নিয়ে উপন্যাসের শেষপর্বে সত্যচরণের অনুশোচনা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছিল এইভাবে- "পরে সেই বনপথে অন্ধকারের মধ্যে নামিতে নামিতে ভাবিলাম, লবটুলিয়া গিয়াছে, নাঢ়া ও ফুলকিয়া বইহার গিয়াছে- কিন্তু মহালিখারূপের পাহাড় রহিল- ভানুমতীদের ধনঝরি পাহাড়ের বনভূমি রহিল। এমন সময় আসিবে হয়তো দেশে, যখন মানুষে অরণ্য দেখিতে পাইবে না - শুধুই চাষের খেত আর পাটের কল, কাপড়ের কলের চিমনি চোখে পড়িবে, তখন তাহারা আসিবে এই নিভৃত অরণ্যপ্রদেশে, যেমন লোকে তীর্থে আসে। সেই সব অনাগত দিনের মানুষদের জন্য এ বন অক্ষুণ্ণ থাকুক।"[১] আদিবাসীদের সহজ সরল আরণ্যক জীবনের ওপর নেমে আসা আর্থিক অভিঘাতের আশঙ্কাও অনুমান করেছিলেন, লিখছেন- "এ অঞ্চলে মরুমকাঁকর ও পাইওরাইট্‌ বেশি মাটিতে, ফসল তেমন হয় না- হইলে এ-বন কোন কালে ঘুচিয়া যাইত। তবে যদি তামার খনি বাহির হইয়া পড়ে, সে স্বতন্ত্র কথা। ...ভানুমতী মাথায় করিয়া এঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা বাজারে ফিরি করিতে বাহির হইয়াছে- ক-ই-লা-চা-ই-ই- চার পয়সা ঝুড়ি।..."[২] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করে আদিবাসী আর্থ-সামাজিক জীবনে যে বিপন্নতা ও আঘাত বাস্তব হয়ে উঠেছিল, তার সাহিত্যিক নির্মাণ অতি অবশ্যই রমাপদ চৌধুরীর *অরণ্য আদিম* উপন্যাসটি। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসে যে সময়কালকে লেখক তুলে এনেছেন তা উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণ। অবশ্য এই সন্ধিক্ষণ ছিল

সভ্য জগতে, সেই সময়ের বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে পাহাড়ের নীচে একদল অরণ্যচারী তখনও নিজেদের মধ্যে প্রাচীন পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এতকাল তারা খাজনা দেয়নি, সংস্কারের বশে বিশ্বাস করত খাজনা দেওয়া পাপ, লাঙ্গল দিয়ে কর্ষণ করে জমিতে ফসল ফলানো পাপ, তাই মাটি ভেঙে জল দিয়ে নরম করে বীজ ছড়িয়ে ফসল ফলিয়েছে তারা এবং তাকেই দেবতার আশীর্বাদ বলে জেনেছে। খাজনা দেওয়ার পাপ থেকে রক্ষা পেতে নিশ্চিন্ত বাসভূমি ছেড়ে, তৈরি করা জমি ছেড়ে চলে গেছে অন্য কোথাও, অন্য কোনো আশ্রয়ের খোঁজে, রুক্ষ পাথুরে মাটিকে ফসলের উপযোগী করে তুলেছে পুনরায়। একদল মুণ্ডার এই স্থানান্তরের কাহিনি দিয়েই উপন্যাসের সূত্রপাত। ছোটো পাহাড়ি নদীর ধারে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে লাপ্‌রায় নতুন ডিহি পত্তনের নির্দেশ দেয় দলের প্রধান গাসি মুণ্ডা, পাতার ছাউনি দিয়ে অবিবাহিত যুবকদের "গিতিওড়া" নির্মিত হল গ্রামের মুখে আর মেয়েদের গ্রামের মাঝখানে। এই "গিতিওড়া" সম্পর্কে শরৎচন্দ্র রায় লিখছেন- "The unmarried young men and girls of the a Munda family do not generally sleep at night in the family–residence. And to strangers and foreigners it is at first a mystery where they pass the night. But once you succeed in gaining their confidence, the Munda of a village will tell you where the 'giti-ora' of their young bachelors and that of their maidens respectively are....And similarly, all the unmarried girls of a village or a hamlet sleep together in the night in a house belonging to some childless old Munda couple or to some lone elderly Munda widow."[৩] প্রতিষ্ঠা করেছে গ্রামদেবতার। বুড়ো বটের নীচে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সারনা। "সারনা" হল- "...many a Munda village still retains a portion or portions of the original forest to serve

as Sarnas or sacred groves. In some Mundari villages, only a small clump of ancient trees now represents the original forest and serve as village–Sarna. These Sarnas are the only temples the Munda know."[৪] গাসি মুণ্ডা তাই সাবধান করে দিয়েছে জারার আগুন যেন সেই গাছের পাতা না ছোঁয়। খুটকাট্টি প্রথায় নির্ধারিত হয়েছে মুণ্ডা গ্রামের সীমানা, সেই সীমানার মধ্যেকার ভূমি ভাগ করে দেওয়া হবে প্রয়োজনমতো দলের সকলকে চাষের জন্য। জমি ও ফসল সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে চারজন খুটকাট্টিদার। এই খুটকাট্টি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রাচীন জীবনযাপনে ও রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত মুণ্ডা সমাজের মধ্যেও যে দলাদলি, ক্ষমতার রাজনীতি বর্তমান ছিল, তাকেও প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক। গাসি মুণ্ডা ও পানা মান্‌কির ক্ষমতাদ্বন্দ্বের মধ্যেই খুটকাট্টিদার নির্বাচিত হয়েছিল গাসি মুণ্ডার সিদ্ধান্তমতো। ফলে, চকমকি পাথর দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে অরণ্যকে পুড়িয়ে জমি তৈরির প্রাথমিক ধাপ "জারা"য় অনুপস্থিত থাকে পানা মান্‌কি। ঔপন্যাসিক এই জারার চিত্র আঁকলেন এইভাবে- "সারা রাত সারা দিন ধরে চলে নাচ আর গান, যতক্ষণ না জারার আগুন আপনা থেকে নিবে যায়। বিলম্বিত লয়ে টেনে টেনে একটা কলির ধুয়ো ধরে একজন, তারপরই গলায় গলা মিলিয়ে একসঙ্গে গেয়ে ওঠে সকলে। পাহাড়ের গা থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে সে গানের। এদিকে টাঙি উঁচিয়ে তৈরি থাকে পুরুষেরা। আগুনের তাপে প্রাণভয়ে না গ্রামের দিকে ছুটে আসে বন্য জানোয়ারের দল। সে ভয়ে থেকে থেকে চিৎকার করে পুরুষেরা।"[৫] প্রাচীন সংস্কার মেনেই চলছিল গাসি মুণ্ডার নেতৃত্বে এই মুণ্ডা গ্রাম। মেয়েদের গিতিওড়ার প্রধান বা ওড়া-আয়ু বা ওড়া-মা প্রচণ্ড জ্বরে প্রলাপ বকতে শুরু করলে তার ওপর ডাইনির প্রভাব পড়েছে বলে ধরে নেয় মুণ্ডা সমাজ। ডাইনি ছাড়ানোর নৃশংস অত্যাচারে মারা যায় সে। এমনই একটা সময়ে লাপ্‌রায় আবিষ্কার হল কয়লা, কয়লার টানে এল ব্যবসায়ী মানুষ, সাঁওতাল, ওঁরাও ও

অনাদিবাসী মজুর, সাজসরঞ্জাম। মুণ্ডাদের সারনা থেকে বেশ খানিকটা দূরে পাহাড়ি ঝর্নার পাশে তাঁবু ফেলল। মুণ্ডারা অবাক চোখে দেখেছে চকমকি পাথর ঠুকে নয়, সামান্য দেশলাইয়ের আঁচড়ে জ্বলে উঠছে আগুন, অনায়াসে বানিয়ে তুলছে ঘর, তামার চাকতিতে কিনে নিতে পারছে ইচ্ছেমতো জিনিস। বলে নেওয়া ভালো, ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শুরুতেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এরা রেললাইন, ইলেক্ট্রিক বা দেশলাইয়ের সাহায্যে আগুন জ্বালানোর খবর জানত না। লাপ্রায় গ্রামপত্তনের পর অবশ্য মৃদু পরিবর্তনের ঢেউ মুণ্ডা সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। পঞ্চায়েতের কঠোর অনুশাসনের ভয় মুণ্ডা যুবক-যুবতিদের মনে আগেই আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল গোঁসাইদের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি। বীজ ছড়িয়ে ফলানো ফসলের থেকে লাঙলের দ্বারা কর্ষিত ভূমি বেশি ফসল দেয় দেখে পুরোনো সংস্কার ও ফসল ফলানোর প্রথাকে মনে মনে অস্বীকার করতে চাইছিল যুবকেরা। এমন সময় লাপ্রায় খাদানের আবিষ্কার মুণ্ডাদের মনে জাগিয়ে তুলেছিল সেই জগতের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। একদিকে গ্রামসমাজে পঞ্চায়েতের অনুশাসনের চোখ রাঙানি, অন্যদিকে খাদানের স্বাধীন জীবনের হাতছানি– উভয়ে একত্রে মুণ্ডা গ্রাম সমাজে ভাঙন ধরায়। মুণ্ডারা দূর থেকে দেখেছে খাদানে খাজনা আদায়কারীর ভয়ে তটস্থ থাকতে হয় না, জমি–জায়গা ফেলে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে পথে নামতে হয় না, ফসলের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না- "কলের তৈরি কাপড় পরে মেয়েগুলো, হাতে রঙিন কাচের জলচুড়ি, কানে গলায় রুপোর গহনা। আর পুরুষগুলো মদে চুর হয়ে থাকে। ওখানেও তাদের মতোই মাদল বাজে সারারাত, নাচে আর গায় মেয়ে-পুরুষ মিলে।"[৬] ফলে, কোলিয়ারির স্বপ্ন লাগে মুণ্ডা গ্রামের অনেকের চোখে। আকুম ও গাসি মুণ্ডার মেয়ে রাঙিনা পরস্পরকে ভালোবাসে, কিন্তু উভয়ের ভিন্ন গোত্র। মুণ্ডা সমাজে ভিন্ন গোত্রে বিবাহই স্বীকৃত। কিন্তু এখানে ঔপন্যাসিক জানালেন, একমাত্র সান্ডিল কিল্লির বিয়ে হয় সমগোত্রে। সমাজের নিয়মে ঘর বাঁধতে পারবে না আকুম ও রাঙিনা। তারা

ভালোবাসার ঘর বাঁধতে পালিয়ে যায় খাদানে, কাজ নেয় সেখানে; কারণ সেখানে পঞ্চায়েতের অনুশাসন নেই, নিয়ম-নীতির কঠোরতা নেই, নিষেধভঙ্গে শাস্তির ভয় নেই। দিকুদের খাদানে চলে অন্য রীতি, অন্য নিয়ম। মুণ্ডা গ্রামসমাজের বুকে নেমে আসা এই আর্থ-সামাজিক অভিঘাতে বদলে যায় সংস্কারও। ট্যাবু ভাঙে। মাটিকে কর্ষণ করার ছাড়পত্র দিতে বাধ্য হয় গাসি মুণ্ডা, নইলে সমাজ ধরে রাখা যাবে না। সবাই চলে যাবে খাদানে। কিন্তু তাও ধীরে ধীরে প্রায় সকলেই ধর্মের ভয়, পাপের ভয়কে অবহেলা করে চলে যায় খাদানের কাজে- "গ্রাম ভেঙে গেল। শহর গড়ে উঠল। দেহাতি গাঁ থেকে একে একে প্রায় সকলেই উঠে এল খনি-শহরে।"[৭] সমাজ ভেঙে যাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় গাসি মুণ্ডা পাগল হয়ে যায়। পাগল গাসি মুণ্ডা টাঙি হাতে কখনও নেচে বেড়ায় বনে, কখনও চুপ করে বসে থাকে সারনাতলায়। কেউ তাকে আর ভয় করে না, কেউ তার খবর রাখে না।

খাদানের কুলি-কামিন হওয়া মুণ্ডা নর-নারী আকুম-রাঙিনার যে ছবি ঔপন্যাসিক তুলে আনলেন, তাতে রাঙিনার ওপর *আরণ্যকের* ভানুমতীকে ঘিরে তৈরি হওয়া আশঙ্কার ছায়া পড়েছে- "সারাদিন রোদ বৃষ্টি সহ্য করে গাঁইতির পর গাঁইতি চালায় আকুম, ঘাম ঝরে পড়ে সারা শরীরের, আর রোদে-তাতা জ্বলন্ত বালি নয়তো আঁকাবাঁকা শীর্ণ পথ ধরে মাটি পাথর বোঝাই করা ঝুড়ি বয়ে ওপরে উঠে আসে আর নেমে যাওয়ার কাজ রাঙিনার। শাড়িটা ঘামে ভিজে লেপটে যায়, মনে হয় যেন বৃষ্টিতে ভিজে এল।"[৮] খনি শহরের কুৎসিত চেহারার সঙ্গে তাড়াতাড়িই পরিচয় ঘটে গেল আকুম-রাঙিনার। একদিকে সাঁওতালরমণী মোংলার সঙ্গে আকুমের অবৈধ প্রণয়, অন্যদিকে গোপীচাঁদ মুনশিদের যৌনক্ষুধার শিকার হওয়া খনির আদিবাসী কামিনরা। রাঙিনার স্পষ্ট উপলব্ধি ঘটে- "কাপড় আর গয়নার লোভ দেখিয়ে মোংলার মতো মেয়েদের নষ্ট করেছে মুনশিরা, আর মোংলারা নষ্ট করেছে আকুমদের। রাঙিনা যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। ধাওড়ার মেয়েপুরুষ সব ধীরে ধীরে পাপের পথে এগিয়ে

চলেছে।”[৯] ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধতে চেয়ে সমাজ ছেড়ে খাদানের কাজে চলে এসেছিল রাঙিনা, অথচ সেই ভালোবাসাকেই কেড়ে নিয়েছে খাদানের পরিবেশ, মোংলা। রাঙিনা ফিরে যেতে চেয়েছে বাবার কাছে, গ্রামের কাছে, জমির কাছে। মদের নেশায় রাঙিনার মাথায় আঘাত করে আকুম। বিচারে আকুমের জেল হয়। মোংলার সঙ্গে প্রণয়ের জেরে এই আক্রমণ ঘটে বলেই মোংলাকে “ডাইনি” সাব্যস্ত করে আদিবাসী ধাওড়া সমাজ। ওঝা দিয়ে বিচার করে খনির আদিবাসী মানুষদের মোংলাকে “ডাইনি” দেগে দেওয়া প্রমাণ করে আদিবাসী মনে থেকে তাদের জন্মগত সংস্কারকে উপড়ে ফেলাও সহজ নয়। অন্যদিকে, মোংলার মানবিক দিককে ঔপন্যাসিক উন্মোচিত করেছেন আকুম-রাঙিনার অবর্তমানে মোংলাকে তাদের সন্তানের দায়িত্ব দিয়ে এবং পরবর্তী সময়ে গোপীচাঁদের লালসার হাত থেকে রাঙিনাকে আগলে রেখে। বিধবা নিঃসঙ্গ মোংলার যন্ত্রণাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন লেখক, তাই তো গোপীচাঁদের ষড়যন্ত্রে ডাইনি ভেবে আকুমের মোংলার ওপর তির দিয়ে আঘাত পাঠকের হৃদয়ে ব্যথা জাগিয়ে তোলে। আকুম ও রাঙিনা আবার মিলিত হয়, ফিরে যেতে চায় তাদের গ্রামের জীবনে। কিন্তু আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর ক্রমাগত এই অভিঘাত ও পালাবদলের বাস্তবতার সঙ্গে তাদের পূর্ববর্তী জীবনে ফিরে যাওয়ার চিত্র সাহিত্যিক সত্য হতে পারত, পাঠকের আকাঙ্ক্ষিত পথ হতে পারত, কিন্তু বাস্তবের সত্য হত না। তাই আকুম আর রাঙিনা আবার খাদানের পথে হাঁটা লাগালো, গ্রামের অন্ধকার পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে ফিরে গেল আলোক উজ্জ্বল খাদানের পথে-

“আকুম হঠাৎ আবার থেমে দাঁড়ালো।

তারপর বললে, গাঁও দেহাতটা মাটি বটে খাদানটাও মাটি বটে।

- হুঁ।

- মাটি তো মা বটে আমাদের। তো খাদানটা বিষ হবে?

তাই তো। চাষের মাটি আর খাদের মাটি-দুই তো মা। তবে খাদটা বিষ হবে কেন।...

রাঙিনাও হাসল।– হুঁ, আলো আছে, মাটির মুখে হাসি আছে। বলে হনহন করে দুজনেই খাদের পথে ফিরতে শুরু করল। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে আকুম হঠাৎ বললে, জলদি। উদের বলতে হবে মোংলা ডাইন নয়, ডাইন নাই।"[১০]

ভালোবাসার জন্য সমাজত্যাগের ঘটনা আছে *অরণ্য আদিম*-এর পূর্ববর্তী রচনা কালীপদ ঘটকের *অরণ্য-কুহেলী* উপন্যাসেও। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে, *অরণ্য আদিম* প্রকাশের প্রায় আট বছর আগে। উপন্যাসের শুরু রামপুরার সাঁওতাল পাড়ার সর্দার রাবণ মাঝির মেয়ে দুলালীর সঙ্গে ঘুসরুকাটার মোহন টুডুর বিবাহের আয়োজনের মধ্য দিয়ে। মোহন ও দুলালী পরস্পরকে ভালোবাসে, কিন্তু এই বিবাহ ও প্রেমের পথে বাধ সাধে টুয়াই মাঝি, তার নাতি টুংরা এবং সাঁওতাল সমাজের বীরত্বের প্রতি মোহ। উপন্যাসের মূল সুর প্রেম, উপন্যাসের শুরুতে ঔপন্যাসিক বলেছেন, "বর্ত্তমান উপন্যাস 'অরণ্য কুহেলী' আরণ্যক আধিবাসিদের প্রেমজীবনের সেই সংঘাত–আলেখ্য;-হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে প্রেমের বৈজয়ন্তীর প্রতিষ্ঠা,-মানুষের অন্তর-মাহাত্ম্যের অবিনশ্বর ইঙ্গিত।"[১১] ব্যক্তিক ইচ্ছা ও মতামতকে উপেক্ষা করে দুলালীর বিবাহকে বেঁধে দেওয়া হল তিরন্দাজির, লক্ষ্যভেদের পারদর্শিতার সঙ্গে। টুংরার বাঘ শিকারের বীরত্বের নীচে চাপা পড়ে যায় মোহনের ছোঁয়া বা স্পর্শে ওঠা মাদল ও আড়বাঁশির সুর। দুলালীর ভালোবাসার মর্যাদা দেয়নি সাঁওতাল সমাজ, এমনকি বাবা রাবণ মাঝিও। শুধু মা টুশকী মেঝেন জেনেছিল দুলালীর মনের খবর, মোহনের সঙ্গে ভেঙে যাওয়া বিয়ের ব্যথা। তিরন্দাজিতে দুর্ধর্ষ টুংরার কাছে মোহনকে জিতিয়ে দেওয়ার অসম্ভব কল্পনা করেননি লেখক; বরং সমাজের সহানুভূতিহীন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সমাজত্যাগ করেছে দুলালী ও মোহন।

মোহন ছেড়েছে তার ঘর-জমি, আর দুলালী বাবা-মায়ের ভালোবাসা, আস্থা। উভয়ে আশ্রয় নিতে চলে গেছে কোলিয়ারিতে। সাঁওতাল সমাজ উভয়ের জন্য শাস্তির বিধান দিয়েছে, মোহনকে একঘরে করে পুড়িয়ে দিয়েছে তার ঘরবাড়ি। এরপরেই সাঁওতাল কৃষক যুবক মোহনের জীবনে লেখক আঁকলেন কোলিয়ারির জীবনকে, মজুরের জীবনকে- "পাথরডি কলিয়ারি। ধানবাদ ঝরিয়া লাইনের পাথরডি স্টেশন থেকে কলিয়ারির ব্যবধান ক্রোশখানেকের মধ্যেই। এই খাদেই মালকাটার কাজ করে মোহন মাঝি।"[১২] মজুরের কাজে মন না লাগলেও দুলালীও মেনে নিয়েছিল কোলিয়ারির জীবনকে। বয়লারের ধোঁয়া ও কয়লার পাহাড়ের ফাঁকে তার চোখ খুঁজে বেড়াত ফেলে আসা সবুজকে, উন্মুক্ত প্রান্তরকে- "মনে মনে হাঁপিয়ে উঠতো দুলালী, মনে পড়তো তার সাঁওতাল পরগণার চোখ জুড়ানো সেই সবুজ মাঠ, ঝকঝকে তকতকে সাঁওতাল পল্লী, ঝরঝরে মুক্ত নীল আকাশ, চারিদিকে মহুয়ার বন, বিস্তীর্ণ ময়দান জুড়ে বড় বড় ভুট্টার ক্ষেতে সবুজের ঢেউ খেলানো, সে দেশের বাতাসটি পর্যন্ত রকমারি ফুলের গন্ধে ভরা।"[১৩] তার এই মধুর সবুজ স্মৃতির বিপরীতে বর্তমান বাস্তব জীবনের অর্থনৈতিক পালাবদল দিয়েছে শুধু মানুষের ভিড়, হরেকরকম কথার ক্লান্তি আর বাতাসে কয়লার সূক্ষ্ম কণার দূষণ। ভালোবাসার জন্য সমাজত্যাগ করে খাদানের জীবনে আসার ঘটনা ও এই জীবনে ভালোবাসার পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার মুখোমুখিতে *অরণ্য আদিম*-এর রাঙিনা ও এই উপন্যাসের দুলালী দোসর। কোলিয়ারির জীবন উভয়ের ভালোবাসাকেই কেড়ে নিতে চেয়েছিল। মোহনের জীবনে নতুন প্রণয় বিধবা বাউরি মেয়ে সুন্দরা। মোহনের বিশ্বাসঘাতকতা দুলালীর মনে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, তাকেও সে স্বীকার করে নিয়েছিল স্বসমাজচ্যুতিজনিত অসহায়তায়। কিন্তু বাবা রাবণ মাঝির আকুতি, ফিরে যাবার ডাক ও মোহনের ষড়যন্ত্রে বাবার অসম্মানকে দুলালী মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু, লেখক দেখালেন আসলে কী ভীষণ ষড়যন্ত্রের শিকার দুলালী। সমাজ অনুশাসন, নিয়ম ও প্রতিশ্রুতির নীচে

কীভাবে চাপা পড়ে যায় পিতৃসত্তাও। সমাজের অনুশাসন মানার সংস্কারে রাবণ মাঝি ছল করে সন্তানের সঙ্গে, বাৎসল্যের ছল। প্রেম ও প্রেমজনিত হিংসা ও আক্রোশের আবহে যেটুকু অংশজুড়ে কোলিয়ারি জীবনের কথা ঔপন্যাসিক তুলে এনেছেন তাতে কোলিয়ারির অন্ধকার দিকই উঠে এসেছে। টমাস সাহেবের যৌনলালসার শিকার হতে হয় কোলিয়ারির বহু কামিনকে। দুলালীকেও ভোগের সামগ্রী করতে চেয়েছিল সে, কিন্তু মোহনের সাহস ও তৎপরতায় রক্ষা পায় দুলালী। মোহন দুলালীকে শুধু রক্ষাই করেনি, টমাস সাহেবকে উচিত শাস্তি দিয়ে সেই চরণপুরের খাদান থেকে তারা পালিয়ে যায়। আকুম ও রাঙিনা গ্রামে ফেরেনি, কুলি-কামিনের জীবনে শেষপর্যন্ত টিঁকে গেছিল। কিন্তু কালীপদ ঘটক দুলালীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তার গ্রামে, অবশ্য পটভূমি পৃথক। দুলালীর ফিরে পাওয়া গ্রাম খাদানের জীবনের থেকেও দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। সমাজ অনুশাসন ভেঙে পালিয়ে যাওয়ায় দুলালীকে একঘরে করে নুলোর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে টুংরার প্রতিহিংসা ও দুলালীর প্রতি অন্ধপ্রেম, নুলোর হত্যা, দুলালীর গ্রেপ্তারি, মোহনের ফিরে আসা উপন্যাসকে অন্যবাঁক দিয়েছে। শেষে টুংরার আত্মসমর্পণে মোহন-দুলালীর মিলন ঘটলেও তারা আর মজুরের জীবনে ফিরে গেছিল কিনা ঔপন্যাসিক জানাননি; বরং কুৎসিত ভয়ংকর টুংরা প্রেমে ও ঘৃণায় রক্তমাংসের মানুষ হয়ে মোহনের থেকেও বেশি জ্যান্ত হয়ে ওঠেছিল শেষপর্যন্ত। প্রেমের কথা বলবেন বলে লেখক যে উপন্যাসের শুরু করেন, সেই উপন্যাসের শেষে প্রেমের ব্যাপ্তি বোধহয় এমনই হয়- "টুংরা এগিয়ে চললো। প্রকাণ্ড বটগাছটার সামনে গিয়ে থমকে একটু দাঁড়ালো টুংরা। বটগাছের শিকড়ের সঙ্গে লোহার চেন দিয়ে বাঁধা ভালুকটার দিকে চোখ পড়তেই টুংরার চোখ দুটো যেন ছল্ ছল্ ক'রে উঠলো; অতি করুণভাবে একটা ডাক দিলে টুংরা,- ঝাবড়ু!"[১৪] মানব-মানবীর

প্রেম-ঘৃণার এই আখ্যানে জড়িয়ে থাকে নানাবিধ কারণে কৃষিজীবী মানুষের মজুরে পরিণত হওয়া ও সেই অভিঘাতে ভেঙে যাওয়া সংস্কার এবং অন্য সংগ্রামের কাহিনি।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *শতকিয়া* সুবোধ ঘোষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ উপন্যাস। উপন্যাসের বিস্তৃত আয়তনে ঔপন্যাসিক মধুকুপি গ্রামের আদিম কিষান জীবনের ওপর নেমে আসা ত্রিবিধ আগ্রাসনের ছবি তুলে ধরেছেন- মিশনারি আগ্রাসন, হিন্দু ধর্মের আগ্রাসন এবং অরণ্য ও কৃষিকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া পুঁজিবাদী শিল্পের আগ্রাসন। অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থায় ভূমিহীন কৃষকদের বঞ্চনা ও প্রশাসনিক শোষণকেও পাশাপাশি তুলে ধরেছেন যা উক্ত ত্রিবিধ আঘাতের সহযোগী ভূমিকাই পালন করেছে। মধুকুপি গ্রামের দাশু ও মুরলীর দাম্পত্য জীবনের নানাবিধ ওঠা-নামা, যৌন ও সন্তান আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে লেখক মধুকুপির জীবনের ক্রম পরিবর্তনশীলতাকে তুলে ধরেছেন, যা মূলত আর্থ-সামাজিক। উপন্যাসের মূল চরিত্র দাশু ও মুরলীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বও যেন দ্রুত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এবং আদিম সংস্কার ও জীবনকে টিকিয়ে রাখার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। মুরলীর হিসেবি পাল্টে যাওয়ার বিপরীতে দাশুর আমৃত্যু মধুকুপির প্রাচীন জীবন ও ধ্যানধারণাকে বুকের বাঁচিয়ে রাখার নিরন্তর প্রয়াসের গল্প শোনায় এই উপন্যাস। উপন্যাসে আরও উঠে আসে স্বাধীনতা পরবর্তী সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা, মনিষপ্রথা এবং এক চাষির নিজস্ব জমির স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি। উপন্যাসের শুরু মধুকুপি গ্রামের প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে ডরানি নদী, যেখানে গরমের দিনেও হাঁটু জল থাকে। আছে কাদা মাখা মোষের পিঠের মতো বেঁটে বেঁটে কালো কালো পাহাড় বড়ো কালু আর ছোটো কালু। গ্রামের পাশেই মধুকুপি জঙ্গল। সেই জঙ্গলে আছে বেলগাছের নীচে কপালবাবার থান; একটা গোল পাথর ও একটা খুলি। আর আছে কানারানি। এই মধুকুপি গ্রামের সবাই জনমজুর, মনিষ- "পরের মাটি কাটে, পরের জমি

চষে, পরের গো-গাড়ি হাঁকায়, পরের ঘরের চালা ছায় আর পরের পালকিতে বেহারা খাটে।"[১৫] এই উপন্যাসে নিপুণ বাক্যবিন্যাসে লেখক অরণ্যনির্ভর জীবনের কৃষিনির্ভর হয়ে ওঠার পরিবর্তনকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন এইভাবে- "জঙ্গলকে একেবারে পর ভাবে না, কিন্তু ক্ষেতের মাটিকে বেশি ভালবাসে; কাঁড় টাঙ্গি ছেড়ে দেয়নি, কিন্তু লাঙ্গল কোদাল হাতে তুলে নিয়েছে।"[১৬] লেখক জানাচ্ছেন জাতের পেশা বলে কোনো ধরাবাঁধা পেশা ছিল না মধুকুপিতে। দাশুর বাবা ছিল কাঠুরিয়া, দাদু মাটিয়াল। দাশু প্রতি বছর দুটো মাস গোবিন্দপুরে ঘর ছাইতে যেত বলে "ঘরামি"। তবু মধুকুপির মানুষেরা মনেপ্রাণে কৃষক। আদিবাসী কৃষক। মাটির সঙ্গে তাদের ভালোবাসার সম্পর্ক। সুরেন মাঝি ছোটো গরুর গাড়ি করে মরা শাল কুড়িয়ে এনে বিক্রি করত, হরিপদ জঙ্গলের মৌচাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করত, জমিকেন্দ্রিক বিবাদের জেরে পাঁচ বছর জেলের শাস্তি পাওয়া দাশু জানতে পারেনি মধুকুপির এই অরণ্যনির্ভর ও কৃষিনির্ভর জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। সুরেন আর মরা শাল কুড়োয় না, সে এখন এজরা ব্রাদার্স কোলিয়ারির মালকাটা। বড়োকালু পাহাড়ের পেছনদিকের ঘন শালবনকে খাবলে খেয়েছে পুঁজিবাদী শিল্পব্যবসায়ীর দল। তৈরি হয়েছে বড়ো বড়ো কয়লার খাদ। ছোটোকালু পাহাড়ের পেছনে বসেছে রেললাইন, সেই লাইনে করেই দ্রুত খেলারির সিমেন্ট পৌঁছে যাবে রামগড়ে, আর লোহারডাগার বক্সাইট পৌঁছে যাবে মুরির অ্যালুমিনিয়াম কারখানায়। মধুকুপির মহুয়ার জঙ্গলের বুক ছিঁড়ে দশ বিঘা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা রেলওয়ে স্টোরে পড়ে থাকে সারি সারি ওয়াগন। মধুকুপি গ্রামের দাশুর চিরপরিচিত হরিপদ আর মৌচাক ভাঙে না, এইখানে লোডিং আনলোডিং-এর কাজ করে। মধুকুপির ত্রিশ মাইলের মধ্যে রেললাইন না থাকা, হাসপাতালের ওষুধ না খেয়ে কপালবাবার বেলপাতায় বিশ্বাস রাখা, ভাদ্র মাসে একসঙ্গে করম নাচার সংস্কারের গর্ববোধ আহত হয়েছে। মুরলী করম নাচেনি, সে হাসপাতালের ওষুধ খেয়েছে, মধুকুপির পাশেই বসছে রেললাইন। মুরলীর

পরিবর্তনই সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছিল দাশুকে। মুরলী আর খাটো শাড়ি পরে না; পাট করা শাড়ি, গায়ে জামা ও পায়ে চটি জুতোয় সজ্জিত মুরলী দাশুর অচেনা। ঘরে পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত বিছানা। জেল থেকে ফিরে এসব ইঙ্গিতই দাশুকে বুঝিয়ে দেয় কিষানি জীবন থেকে বহু দূর হেঁটে গেছে মুরলী। সিস্টার দিদির দেওয়া সেলাইকল মুরলীর শুধু আর্থিকজীবনেরই পরিবর্তন ঘটায়নি, সেই আর্থিক সুখ ও অবস্থান নিয়ে এসেছে রুচিবোধ ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের সচেতনতা। অথচ পুরোনো সত্তাকে একেবারে উপড়ে ফেলা যায় না বলেই মুরলী দাশুর প্রতি যৌন আকর্ষণকে অস্বীকার করতে পারেনি। মুরলীর মধ্যে নিপুণভাবে লেখক এঁকেছেন কিষান দাশুর প্রতি যৌন আকর্ষণ, সন্তান-আকাঙ্ক্ষা এবং কিষান জীবন থেকে উত্তরণের পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে। তাই সে দাশুকে নিয়ে যেতে চায় কলের খাদের চাকরি জীবনে। দাশু যখন নিজের জমির স্বপ্নকে, কিষান হওয়ার গর্বকে, প্রাচীন রীতি-নীতি সংস্কারকে ক্রমাগত আঁকড়ে ধরেছে, তখন হিসেবি মুরলী কিষানি জীবন থেকে ক্রমশ মুক্তির পথ খুঁজেছে। আর্থিক নিশ্চয়তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজে সে কলের মিস্ত্রি খ্রিস্টান পলুস হালদারের হাত ধরেছে, ধর্মান্তরিত মুরলী হয়েছে জোহানা। অথচ পলুসের সংসারেও সুখ পায়নি মুরলী। পলুস তাকে গ্রহণ করেছে, দাশুর ঔরসে তার গর্ভের সন্তানকে নয়। ফলে পলুসের প্রতি মুরলীর ক্ষোভ ও অসন্তোষ তাদের দাম্পত্যকে শীতল ও সম্পর্ককে অ-সুখের করে তুলেছে। পরবর্তীসময়ে মুরলী মিশনারি স্কুলে লেখাপড়া করে, গান শিখে, মার্জিত কথাবার্তা ও রুচিবোধে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে ডাক্তার রিচার্ড সরকারের উপযোগী করে। সামাজিক উত্তরণের হিসেবের অঙ্কে পাকা হিসেবি মুরলীর আর্থিক, সামাজিক ও যৌন আকাঙ্ক্ষার বৃত্তটি কিন্তু শেষপর্যন্ত অসম্পূর্ণই থেকে যায়। নপুংসক ডাক্তার রিচার্ডের সঙ্গে তার পরিণয় শেষপর্যন্ত মুরলীকে শো-কেসের পুতুল বানিয়ে তোলে। নিজের শিকড় থেকে বিচ্যুত মুরলী হয়ে উঠেছিল সিস্টার দিদির খ্রিস্টধর্ম প্রচারের একটা সামান্য ঘুঁটিমাত্র।

ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন মিশনারি আগ্রাসন কীভাবে আদিবাসী জীবনের দারিদ্র্য ও বঞ্চনাকে অবলম্বন করে তাদের জৈব বা যৌনজীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। দাশুর অবর্তমানে মুরলীকে জীবিকার উপায় দিয়ে সিস্টার মাদলিন তাকে অসময়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি এই সেবার মহানতাকে ছাপিয়ে গেছে ধর্মপ্রচারের উগ্র নেশা, হিসেব। মুরলী ঘৃণা করেছে আজন্মের সংস্কারকে, কিষানি হওয়া বা করম নাচাকে। দাশুর খ্রিস্টান না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সহবাস না করার প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলেন সিস্টার মাদলিন। এমনকি, মুরলী ও দাশুর সন্তানকে তিনি অনাথ আশ্রমে রেখে আসার পরামর্শ দেন। অনাথ আশ্রমে ঠাঁই পাওয়ামাত্রই সে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হবে। সেখানে ঠাঁই পাওয়া কেউ পুরোনো ধর্মে বা জীবনে ফেরত যেতে পারে না। মুরলী এই প্রথম সিস্টার দিদির আচরণে নিঃস্বার্থ মানবিকতাকে খুঁজে পেল না- "ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মুরলী। সিস্টার দিদির কথাগুলিকে একটা ভয়ানক রাগী গর্জন বলে মনে হয়।"[১৭] উপন্যাসের শেষে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত দাশু খ্রিস্টান হতে অস্বীকার করায় মিশনারি কুষ্ঠ আশ্রমে ঠাঁই হয়নি দাশুর। আদিবাসীদের লেখাপড়া শেখানোটা শুধু বাইবেল পড়তে ও বোঝানোর উদ্দেশ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। মুরলীর লেখাপড়া শেখার ইচ্ছের প্রতিক্রিয়ায় সিস্টার মাদলিন বলেছেন- "মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন সিস্টার দিদি : ধরম বুঝে করম করবে, ধরমের মান রাখবে, খিরিস্তান বেরাদারী আর সিস্টারীর সেবিকা হবে; সুখী হও জোহানা।"[১৮] হারানগঞ্জের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জানিয়েছিলেন- "ফাদার হার্নের নাম নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে গড়ে উঠেছিল যে হার্নগঞ্জ, তারই আজকের নাম হারানগঞ্জ। ডাঙার পর ডাঙা পার হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে ফাদার হার্নের পঞ্চাশ বছর আগের স্বপ্নের উপনিবেশ।"[১৯] সেই উপনিবেশকে স্বাধীন ভারতেও টিকিয়ে রাখার সাধনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থেকেছে সিস্টার মাদলিন। লাল খাপরার চাল আর চুনকাম করা ছোটো ছোটো

অথচ পরিচ্ছন্ন ঘর অতীত ঔপনিবেশিক স্মৃতিকে বুকের মধ্যে লালন করে। এই খ্রিস্টান কলোনির বাসিন্দাদের শিকড় নানা জাত নানা ধর্মের হলেও নতুন পরিচয়ে তারা সকলেই খ্রিস্টান, কলঘরের মজুর- "একই বিশ্বাস, একই আশ্বাস আর একই প্রীতির শাসনে ঘষামাজা একটা নতুন জীবনের মানুষ। ওদের জীবন মাটি-কোপানো আর লাঙল-ঠেলা জীবন নয়। সকাল হলে কিংবা দুপুর হতেই ওরা সাইকেলের সওয়ার হয়ে চারদিকের দু ক্রোশ তিন ক্রোশ পথ পার হয়ে চলে যায় মতিডিহির রেলওয়ে মেরামতির কারখানাতে, এজরা ব্রাদার্সের যত কয়লাখাদের কল-ঘরে, রামনগরের পটারিতে, আর কলিয়াবাগের ফ্যাক্টারিতে।"[২০] আর এই চাকরির জন্য সুপারিশ করে দেন সিস্টার মাদলিন। এক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিবর্তনের সঙ্গেই যুক্ত থাকে আর্থিক পরিবর্তন। আর্থিক পরিবর্তনের ঢেউ সূচিত করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে। ধর্মান্তরিত মুরলীর জোহানা জীবনে করম পুজো, ঝুমুর নাচ, গান পূর্বজন্মের কথার মতো। কিষান জীবনের নর-নারীর প্রেমসঙ্গীত নয়, সে এখন পিয়ানো বাজিয়ে গায়- "প্রিয় জেসু যদি আসিবে!...–মরুতে মরুতে সুধানদী যদি বহিবে! তুমি পিপাসিত কেন রহিবে?"[২১] খ্রিস্টান হলে চাকরি মেলে, খাবার মেলে, আশ্রয় মেলে, ওষুধ মেলে। সেবা দিয়ে ধর্মের প্রচার, ধর্মকে প্রসারিত করার প্রতিজ্ঞায় কঠিন ষাট বছরের ধর্মসেবিকা সিস্টার মাদলিনের ক্লান্তিহীনতাও ভয় জাগিয়ে তোলে- "ঝড়-বাদলের দিনেও যখন ষাট বছর বয়সের সিস্টার মাদলিন তাঁর সেই নীল রঙের ছোট সাইকেলে চড়ে তিন ক্রোশ পথ পার হয়ে জংলী ডিহির এক নতুন খিরিস্তান চাষীকে জ্বরের ওষুধ খাওয়াবার জন্য ছুটে যেতে থাকেন, তখন তাঁকে দেখতে একটু অদ্ভুত রকমের লাগে বইকি! যারা দেখতে পায়, তারা আশ্চর্য হতে গিয়ে একটু ভয় পায়; সিস্টার দিদির দয়া যেন একটা একরোখা প্রতিজ্ঞার অভিযান।"[২২] সেবার মোড়কে, সহায়তার আশ্বাসের মোড়কে মিশনারি আগ্রাসনের স্বরূপ তুলে ধরলেন ঔপন্যাসিক। অবশ্য এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মৃদু আঘাত ও প্রতিবাদ

অবশ্যই দাশুর খ্রিস্টান হয়ে কুষ্ঠমুক্তির থেকে কিষান হয়ে মৃত্যুকে বেছে নেওয়া এবং খ্রিস্টান পলুসের নিজের প্রাচীন বিশ্বাস ও অখ্রিস্টান স্ত্রী সকালীর কাছে ফিরে যাওয়া।

মুরলী যখন দাশুর প্রতি যৌন আকর্ষণকে নিজের মধ্যে গোপন রেখে কিষান জীবনের দারিদ্র্য ও কষ্ট থেকে ধাপে ধাপে আর্থিক স্বচ্ছলতায় ও সামাজিক উত্তরণের দিকে হিসেবি পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন দাশু জমির স্বপ্নে নিজের কিষান জীবনকেই আরও প্রতিষ্ঠা দিতে উদ্‌গ্রীব। দাশু বিশ্বাস করে তার জমির স্বপ্নপূরণ মুরলী ও তার সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। অথচ সেই স্বপ্ন পূরণ হয় না। ঔপন্যাসিক দাশুকে বা মধুকুপি গ্রামের অধিবাসীদের আদিবাসী বলেছেন, কিষান বলেছেন এবং দাশুর মধ্যে কৃষকসত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বিশেষ আদিবাসী গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট পরিচয় উপন্যাসে প্রকাশ পায় না। অবশ্য "কিসান" নামক এক আদিবাসী গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের সম্পর্কে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে লিখেছেন- "কিসানরা আদি-অস্ট্রাল গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। এক সময়ে তারা ছোটনাগপুর অঞ্চলে বসবাস করত, এখনও অনেকে নিজেদের ছোটনাগপুরের নাগবংশী রাজাদের বংশধর বলে দাবি করে থাকে। জীবিকার প্রয়োজনে তারা রাঁচী, হাজারিবাগ, ধানবাদ, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। এখানে আর একটি কথাও উল্লেখ করি। দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির চা-বাগানগুলিতে 'নাগেসিয়া' নামে আর এক আদিবাসী গোষ্ঠী দেখা যায়, তাদের অনেকেই নিজেদের কিসান বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। যতদূর জানা যায়; জীবিকার প্রয়োজনে তারা যখন ছোটনাগপুর থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারা কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কাজ করতে চাইত না। নিজেদের জমি চাষ করে কিংবা অন্যের জমিতে কৃষি-মজুর হিসেবে পরিশ্রম করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। এজন্যই হয়তো প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ তাদের 'কিসান' নামে অভিহিত করে।"[২৩] উপন্যাসের শুরু দাশুর নিজ জমি রক্ষার ঘটনা বা জমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিয়ে।

তার দেড় বিঘা মাত্র চাকরান জমিও রায়বাবু ইঁটখোলা বানাবার জন্য জোর করে দখল করতে চাইলে দাশু টাঙ্গি নিয়ে প্রতিহত করতে যায়, এর জেরেই দাশুর পাঁচ বছরের জেল হয়। ফিরে এসেও মুরলী ও অনাগত সন্তানের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে জমির অধিকার চায়। জমির স্বপ্ন দাশুর সত্তার সঙ্গে কীভাবে মিশেছিল, তা বোঝাতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখছেন- "বিঘা দুয়েক জমি কি কিনতে পারা যায় না? দাশুর ক্লান্ত চোখের পাতায় পাতায় যেন একটা পুরনো স্বপ্নের সাধ ঝির ঝির করে। জমি পেতে হবে। দো-আঁশ হোক, বেলে হোক, এঁটেল বা মেটেল হোক, জমি চাই। গুলঞ্চের বেড়া হলে ভাল হয়, জিরে বুনতে পাড়া যাবে, সোনার দানার মত জিরে। আখ না হোক, সরগুজা হবে। হলদে ফুলে ছেয়ে যাবে পৌরুষের ক্ষেত।"[২৪] জমির আশায় ছুটে গেছে ঈশান মোক্তারের কুঠিতে। দাশুর সঙ্গে অনিশ্চিত কষ্টের দাম্পত্য জীবন ছেড়ে মুরলী চলে গেছে পলুস হালদারের কাছে। সঙ্গে গর্ভে করে নিয়ে গেছে দাশুর সন্তানকে। হাঁড়িয়ায় নেশায় দাশু তার জমির স্বপ্নকে পূরণ হতে দেখে, দেখে সন্তান নিয়ে ফিরে এসেছে মুরলী। জাতপঞ্চের কাছে নিজেদের জমির অধিকারের প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় দাশু। ঈশান মোক্তারের বড়ো গোমস্তা অর্থবান দুখন বাবুকে জানিয়ে দেয় জমি না দিলে তারা ঈশান মোক্তারের জমিতে মনিষ খাটবে না এবং বাইরে থেকে মনিষ খাটার লোকও আসতে দেবে না। দাশুর সমর্থনে জমির অধিকার চায় প্রধান বুড়ো রতন ছাড়া আরও কিষানরাও। একই আদিবাসী গোষ্ঠীর হয়েও দুখনের হাত ধরে কিষাণ সমাজে হিন্দুধর্মের আগ্রাসনের চিত্র তুলে ধরলেন লেখক। কিষান সমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সূচনা হয়ে গেল দুখনের ক্ষমতার লোভের হাত ধরে। অর্থ ও সামাজিক ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে প্রাচীন কিষান সমাজকে সে তিনটে ভাগে ভাগ করে ফেলে- জাতিয়া, খাদিয়া আর কুঁকড়াশী। "জাতিয়া"রা হল যারা ব্রাহ্মণ মানবে এবং কুঁকড়া খাবে না। এরাই হবে কিষানদের মধ্যে অগ্রগণ্য। অথচ কপালবাবার কাছে কুঁকড়া বলি কিষানদের নিজস্ব সংস্কার ও প্রথা ছিল। শুধু তাই নয়, করম

পূজাতে মেয়ে-বউদের নাচ নিষিদ্ধকরণ, বয়সের আগে বিয়ে এবং বিয়েতে ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রের স্বীকৃতি আসলে কিষানদের প্রাচীন ধর্মের ওপর ব্রাহ্মণ্য আগ্রাসন। মিশনারি আগ্রাসনের পাশাপাশি এই আগ্রাসন সমানভাবেই আদিবাসী সংস্কৃতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। উপন্যাসের এই বিস্তৃত ক্যানভাসে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন নারীর ওপর হওয়া যৌনশোষণকেও। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব থেকে স্বাধীনতা উত্তরকাল পর্যন্ত শরীরে ও মনে যৌন লাঞ্ছনাকে বয়ে নিয়ে বেড়ায় মধুকুপির পল্টনী দিদি, তেতরি ঘাসিন, ফুলকি মাসি। নাটকীয় উপস্থাপনভঙ্গিতে যেভাবে মধুকুপির এই অসহায় কলঙ্কের কাহিনিগুলোকে লেখক পাঠকের সামনে তুলে ধরেছিলেন, সেই একইভঙ্গিতে একে একে এদের মধুকুপি ছেড়ে কয়লাখাদে কাজের তাগিদে চলে যাওয়ার খবরও দিয়েছেন। পল্টনী দিদি সন্তানকে খেতে দিতে না পারার অসহায়তায় সন্তানদের তুলে দিয়েছে সিস্টার মাদলিনের হাতে আর নিজে চলে গেছে কয়লাখাদের কামিন হয়ে। ফরেস্ট বাংলোয় আসা বাবুদের কামনার শিকার হতে অস্বীকার করে তেতরিও চলে যেতে চায় কয়লাখাদের কাজে। ঈশান মোক্তারের যৌনসঙ্গী হয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়ার পর ঈশান মোক্তারের ছেলে সন্তানসম লালবাবুর কাছ থেকেও যৌন প্রস্তাব আসলে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ফুলকি মাসি। এর জেরেই লালুবাবুর হাতে শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়ে শেষপর্যন্ত কয়লাখাদে চলে যায় ফুলকি মাসিও। ফুলকি মাসির খোঁড়া স্বামী তিনকড়ি শেষপর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তিতে নামে। দাশু জমি পায়নি, মধুকুপির কিষানরা জমি পায়নি। সাতবছরের বাচ্চাসহ মধুকুপির প্রায় সকলেই রাস্তা বানাবার মজুরে পরিণত হয়। কৃষকেরা শেষপর্যন্ত মজুর হয়ে যায়- সে খাদানের হোক বা সড়ক নির্মাণের। তবু দাশু ভোটের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে, ভাবে সরকার তাদের জমি দেবে, ফসলে ভরে উঠবে ক্ষেত, দাশুর জীবন মুরলী আর সন্তানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু সরকারের জরিপ অধিকর্তাও যখন দাশুকে নিজস্ব জমির আশ্বাস দিতে পারে না, তখন দাশুর

মানসিক অবস্থাকে লেখক ফুটিয়ে তোলেন এইভাবে- "দাশুর হৃৎপিণ্ডের স্বপ্নটা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। আপন জমি নেই, গুলঞ্চের বেড়াও নেই; তবে আর রইল কি? হায় কপালবাবা, তবে আর থাকে কি? তা হলে যে ডরানির স্রোতের জল শুধু জল, বড়কালু শুধু একটা পাহাড়? হরতকীর জঙ্গলের ছায়া একটা ছায়া? তা হলে বেলতলার কপালবাবাও যে শুধু একটা পাথর হয়ে যায়।"[২৫] স্বপ্নভঙ্গের ক্ষত বুকে নিয়ে শেষপর্যন্ত সড়ক নির্মাণের "ভিখমজুর" হয়ে যায় দাশুও। দাশুদের জীবন থেকে ধীরে ধীরে মুছে যায় করমপুজো, মাদলের আওয়াজ, নিজস্ব প্রেমসঙ্গীত। কপালবাবা, বোঙ্গা, বড়োপাহাড়ির জায়গা নেয় বনদুর্গা, গডবাবা। দাশু ডরানির জলে আত্মহত্যা করে। সৎ কৃষকের জমির স্বপ্ন স্বাধীন ভারতেও পূরণ হয় না, তার জীবনব্যাপী প্রতিবাদ ডরানির জলে তলিয়ে যায়। গণতন্ত্রকে প্রহসন করে নির্বাচনে অংশ নেয় মিথ্যাচারী রিচার্ড সরকার ও শোষকশ্রেণির প্রতিনিধি লালুবাবু।

মাসিক "বসুমতী" পত্রিকায় ১৯৫৮ সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের *পঞ্চতপা* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের কাহিনি মূলত আবর্তিত হয়েছে সান্ত্বনা নামক চরিত্রকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের পরিসমাপ্তি তার মৃত্যুতে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন- "শুষ্ক পার্বত্য নদীর উপর বাঁধ বাঁধিয়া অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলে বিপুল জলাধার-নির্মাণের পরিকল্পনা উপন্যাসটির পটভূমিকা। এই পরিবেশের একদিকে সাঁওতাল কুলি-মজুর, অনার্য আরণ্য জাতি, জীবননীতি ও প্রথাবৈচিত্র্য; আর একদিকে, নির্মাণদক্ষ স্থাপত্যবিশারদ কর্মাধ্যক্ষবৃন্দ। ইহাদের মাঝে যোগসূত্র রচনা করিয়াছে অবনী ওভারশিয়ারের মেয়ে, অদম্য জীবনপিপাসা ও কৌতূহলবৃত্তির মূর্ত প্রতীক সান্ত্বনা। নির্মাণকার্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মত সে এই কর্মসাধনার অণু-পরমাণুতে, প্রতি ইঁট-পাথরে, প্রতিটি চড়াই-উৎরাই-এ নিজ সত্তার স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াছে।"[২৬] উপন্যাসে সান্ত্বনার সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী অস্তিত্ব সত্ত্বেও মড়াই নদীতে বাঁধ দেওয়াকে কেন্দ্র করে উঠে আসে সাঁওতাল সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, প্রথা ও জমি থেকে

উদ্বাস্তু হওয়ার চিরকালীন আশঙ্কা ও তদ্‌জনিত বিরোধিতা। মড়াই নদীর চরিত্র বোঝাতে গিয়ে লেখক বলছেন- "পাহাড়ের একেবারে নিচে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে মড়াইয়ের বিশীর্ণ একটা রেখা মাত্র। তার হাড়পাঁজর বার করা জঠরের ক্ষীণ স্রোত শুকনো উপল-পথে ঠোক্কর খেতে খেতে ধারা হারিয়েছে সেই কোন্ যুগে। তার গতিপথের একটা টানধরা আভাস আছে শুধু মরেছে বলেই তো মড়াই! যুগ যুগ ধরে মরে আছে বলেই তো মড়াই! ঘরে সকলকে মারছে বলেই তো মড়াই! আগে কি একটা নাম ছিল যেন নদীটার। সেই নামও মরেছে।"[২৭] বর্ষায় অবশ্য জল থাকে। বছর দুই পাঁচ অন্তর দু'কূল ছাপিয়ে বন্যাও হয়। কিন্তু বর্ষা বিদায় নিতেই মড়া। জলের অভাব মড়াইয়ের দু'পাশের গ্রামগুলোর নিত্যসঙ্গী। তাই মড়াই নদীতে বাঁধ রূপায়ণে যে জলের আশ্বাস ছিল, জমি হারানোর আশঙ্কা তাকে ছাপিয়ে ওঠে। যুগ যুগ ধরে নিজেদের জমি হারিয়ে ছিন্নমূল জীবনের অতীত তাদের আবারও সিঁদুরে মেঘে ঘর পোড়ার আশঙ্কায় ভীত করে তোলে। চিরকাল উন্নতির রথচক্রের নীচে পিষ্ট হয়ে এসেছে আদিবাসীরা। সভ্যতার উন্নতি তাদের যা দিয়েছে, তার চেয়ে কেড়েছে বেশি। তাই সভ্যতায়, উন্নতির আশ্বাসে ভরসা নেই আদিবাসীদের- "সভ্য মানুষের প্রতি অবিশ্বাস। সভ্যতার প্রতি অবিশ্বাস। বনের হিংস্র বাঘ ভালুককে তারা ভয় করে না। কিন্তু এই সভ্যতাকে করে।"[২৮] এই উপন্যাসে মড়াইয়ের ওপর বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে দ্বিধাবিভক্ত সাঁওতাল সমাজের ছবি উঠে আসে। প্রকাশ্যে আসে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। জলের তীব্র সংকট সত্ত্বেও জমি হারানোর আশঙ্কায় সাঁওতাল সমাজের একাংশ যখন সমাজের কথা মেনে বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা করে, তখন অন্য অংশ পাগল সর্দারের নেতৃত্বে বাঁধ নির্মাণের যৌক্তিকতাকে একেবারে উড়িয়ে দেয় না। সাঁওতাল অভ্যুত্থানের নেতা সিদুর উত্তরাধিকারীরূপে "সর্দার" পদবি ব্যবহার করে পাগল, স্ত্রী তাকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে চলে গেছে। আছে একমাত্র মেয়ে চাঁদমণি। গ্রামের প্রধান মাঝির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও

পাগল সর্দারের একদল অনুগত রয়েছে, যারা ভালোবেসে ঘিরে রেখেছে সর্দারকে এবং সর্দারও যাদের রেখেছে স্নেহ ও অভিভাবকত্বের ছায়ায়। সর্দার সবচেয়ে বেশি যাকে ভালোবাসে, সে ওই মাঝির ছেলে হোপুন। হোপুন ভালোবাসে চাঁদমণিকে, বিয়ে করতে চায়। মড়াইয়ের বুকে বাঁধ দেওয়া প্রসঙ্গে সর্দারের মনে হয়- "ওরা বলছে জল হবে। ওরা বলছে জলের অভাব ঘুচবে। হবে কি না কে জানে? ঘুচবে কি না কে জানে?... কিন্তু চেষ্টা হবে। এই চেষ্টাই যদি না হয়, তাহলে? মাটি খাঁ-খাঁ করছে, তাই করবে। মাটির নীচে আগুন জ্বলছে, তাই জ্বলতে থাকবে। মাটির দানায় দুর্ভিক্ষ লেগে আছে, তাই লেগে থাকবে। মাটি ফাটলে উপোস বাসা বেঁধেছে, তাই বাঁধা থাকবে। তাহলে? তাহলে?"[২৯] এই প্রশ্নের উত্তর গিয়ে মিশেছে বাঁধের কাজের সহযোগিতার সিদ্ধান্তে। সঙ্গী হয়েছে অনুগত সাঁওতালের দল। শুধু সমাজের বিরোধিতা নয়, মাঝিরা প্রতিদিন দেখেছে বাঁধে কাজ করতে যাওয়া সাঁওতালের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে গেছে। ফলে, মাঝি অন্যান্য গ্রামের সাঁওতালদের নিয়ে এসে ঝামেলা করেছিল মড়াইয়ের কাছে, পুরো রাগটাই পড়েছিল সর্দারের ওপর। হোপুন সর্দারের রক্ষাকবচ হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল সেইদিন। তারপর আস্তে আস্তে সাঁওতালদের জীবনে চাষের জল আনতে বাঁধের কাজ তাদের কৃষক থেকে মজুর বানিয়ে তুলেছিল। পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন লেখক এইভাবে- "ভিন্ন ভিন্ন গাঁয়ের মাঝিরা সব ভেবে সারা। আজীবন বাঁধাধরা শাস্ত্র আর সংস্কারগত পথ ধরে চলতে অভ্যস্ত তারা। কিন্তু এ সমস্যার সমাধানই বা কি, বিধানই বা কি? আর, তাদের বিধান মানবেই বা কারা? যে যার আত্মীয়-পরিজনকেই সামলাতে পারছে না, অন্যকে বোঝাবে কি করে? বংশগত নিদারুণ দারিদ্র্যের মাঝে কি করে ঠেকাবে এই কাঁচা টাকার আকর্ষণ?"[৩০] স্পষ্টতই, ঔপন্যাসিক দেখালেন জমির ওপর নির্ভর করে থাকা মানুষগুলোর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবন বাঁধনির্মাণের মজুরের কাজেই স্বাভাবিকভাবে আশ্রয় নিয়েছিল। জমি হারানোর আশঙ্কা ছিল, কিন্তু মড়াই থেকে সরে

এসে অন্যত্র বসতি স্থাপনের সুযোগ ও সর্বোপরি মজুরি ও ক্ষতিপূরণের কাঁচা টাকায় একসময়ের বিরূপ মানুষগুলোও একে একে বাঁধের কাজে এসে জুটেছিল। দারিদ্র্য যে পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল, তা আদিবাসীদের জীবিকাগত পরিবর্তনই শুধু বয়ে আনেনি, চাষা থেকে কুলিকামিন হয়ে যাওয়া মানুষদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনেও পরিবর্তনের সূচনা ঘটিয়েছিল। ঔপন্যাসিক বাদনা পরবের প্রসঙ্গে লিখলেন- "বারো মাসে তেরো ছেড়ে তেত্রিশ পার্বণের অজস্রতাই ছিল একদিন ওদের। সেদিন গেছে। পৌষে ধান কাটার উপলক্ষও আর নেই বড়। মেয়ে-পুরুষের প্রধান জীবিকা এখন চাকরি। ক্ষুধার দায়ে পেশা বিকিয়েছে। সে পেশার লাগাম অন্যের হাতে। তবু দুই একটা উৎসবে লাগাম ছেঁড়ে ওদের। বাদনা উৎসবে বেশ ভালো করেই ছেঁড়ে।"[৩১] উপন্যাসে সান্ত্বনাকেন্দ্রিক কাহিনির পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে পাগল সর্দার, চাঁদমণি ও হোপুনের কাহিনি। হোপুনের সতেজ সবল ভালোবাসার আহ্বান সত্ত্বেও চাঁদমণি ফাঁদে পড়েছিল রণবীর ঘোষের মতো এক নারীমাংসলোলুপের। চাঁদমণির হোপুনকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া পাগল সর্দার ও হোপুনের জীবনে অভিশাপ বয়ে নিয়ে আসে। বিটলাহ থেকে শেষ পর্যন্ত পাগল সর্দার বেঁচে যায় বটে, কিন্তু মড়াইয়ের জীবন আর আগের মতো থাকে না। ফলে, পেশাগত বা আর্থিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে আদিবাসীদের নিজস্ব কৌমজীবনে ঢুকে পড়ে রণবীর ঘোষেদের মতো বহিরাগতরা, যার অভিঘাতে আদিবাসী জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। চাঁদমণির খবর না পেলেও রণবীর ঘোষের নারীলোলুপ চোখ দৃষ্টি এড়ায়নি হোপুনের, সান্ত্বনার কাছে পাগল সর্দার সেই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছে- "–কত যুগ বাদে মড়াইয়ে পুণ্যির যুগ এসেছে। সেই পুণ্যিতে শুকনো মড়াইয়ে জল হবে। কিন্তু সেই পুণ্যির সঙ্গে কিছু পাপও এসেছে। 'মুনিষের মূর্তিতে' পাপ এসেছে, পুণ্যিকে 'খুঁতো' করে দেওয়ার মতলব আঁটছে। গোটা 'গেরামে' সে পাপের হল্‌কা লেগেছে, গোটা মড়াইয়ে সে পাপের 'ছেয়া' পড়েছে।...পাগল সর্দার সেই

জন্যেই এসেছে, দিদিয়াকে সাবধান করতে এসেছে। হোপুন বলেছে। হোপুন কখনো বাজে কথা বলে না- 'তু আতবিরেতে একা কুথাও যাস না দিদিয়া, দিনদুকুরেও না। ও পাপ বড় স্যায়ানা। চি-লোকের দিকে তার লজর।"[৩২] সান্ত্বনার ওপর রণবীর ঘোষের কুনজর সম্পর্কে সতর্ক করতে এসেছিল পাগল সর্দার। উপন্যাসের ঘটনাক্রম সান্ত্বনাকে ঘিরে আবর্তিত হলেও পাগল সর্দারের জীবন ও কাহিনিও জুড়ে যায় তার সঙ্গে। সর্দারের পালিয়ে যাওয়া মেয়ে চাঁদমণি একদিন ফিরে এসে সান্ত্বনাকে জানিয়ে গেছিল রণবীর ঘোষের নারীলোলুপতার কথা। সেইদিন সান্ত্বনা বুঝেছিল আসলে মনেপ্রাণে চাঁদমণি ফিরতে চেয়েছে বাবার কাছে, কিন্তু সমাজ তার প্রত্যাবর্তনকে মেনে নেবে না। শুধু নয়, সেই প্রত্যাবর্তন হতে পারে প্রাণঘাতীও। চাঁদমণি তাই বেছে নিয়েছে শিকড়হীন যাযাবর জীবনকে। কিন্তু চাঁদমণির আশঙ্কাকে সত্যি করে মড়াইয়ের ওপরের পাহাড় থেকে একদিন গড়িয়ে পড়ল রণবীর ঘোষ ও চাঁদমণির কঙ্কাল। পাগল সর্দারের মুখে সেদিন সান্ত্বনা দেখেছিল কুৎসিত প্রতিহিংসার হাসি, আনন্দ- যে আনন্দ হোপুন তাকে দিয়ে গেছে। প্রসঙ্গত ঔপন্যাসিক উন্মোচিত করেছেন সুদক্ষ শিকারি পাগল সর্দারের ভয়ংকর শিকারের আখ্যানকে। কোনো এক জাতশত্রু পাহাড়ির হাত ধরে সর্দারের ঘর ছেড়েছিল স্ত্রী ফুলমণি। প্রায় একবছর সুযোগের অপেক্ষায় থেকে সর্দারের নির্ভুল তিরে শিকার হতে হয়েছিল ফুলমণিকে। মড়াইয়ের বুকেই পুঁতে দিয়েছিল সেদিন সর্দার ফুলমণির দেহকে। জলের নীচে পাথর, তার নীচে মাটি আর তার নীচে বহুবছর আগে পুঁতে দিয়েছিল ফুলমণির দেহটাকে পাগল সর্দার। উপন্যাসে সাঁওতাল সমাজের এই ভয়ংকর প্রতিহিংসা ও নিয়মভঙ্গে কঠিন শাস্তির চিত্র তুলে ধরলেন লেখক এই দুটো ঘটনার মধ্যে দিয়ে। মড়াইয়ে বাঁধনির্মাণের কর্মযজ্ঞের মধ্যেই ঘটেছিল ভয়ংকর বন্যা, সেই বন্যা প্রাণ নিয়েছিল সান্ত্বনার। একাধিক জীবনের মূল্যে বাঁধের নিখুঁত প্রতিষ্ঠা। মড়াই কেড়ে নিয়েছে পাগল সর্দারের প্রিয়জনেদের। ফুলমণি, চাঁদমণির পরে সর্দার হারিয়েছে

পুত্রস্নেহে যাকে আগলে রেখেছিল সেই হোপুনকে ও কন্যাসম সান্ত্বনাকে। আঘাতে আঘাতে ভেঙে যাওয়া সর্দার আর নিপুণ শিকারি নয়, ঔপন্যাসিক উপন্যাসের একদম শেষে যে সর্দারের ছবি তুলে ধরলেন তা এইরকম-

"কিন্তু না। ওখানেও বসে ঝিমোয় একজন। নিস্প্রভ-কালো, অতি বৃদ্ধ, ঘাড়-পিঠ-দুমড়নো।

পাগল সর্দার।"[৩৩]

অমিয়ভূষণ মজুমদারের জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ মূলত কোচবিহার বিশেষভাবে যুক্ত। সাহিত্যে রাজপরিবার ও শহরের কথার ছায়া থাকলেও উত্তরবঙ্গের অরণ্য, নদী - তাদের ইতিহাস, ভূগোল, সেখানকার জনজাতি, তাদের জীবনচর্চাকে নিপুণ দক্ষতায় তুলে এনেছেন। কোচবিহারের প্রতি ভালোবাসাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন এইভাবে- "উত্তরবঙ্গের উত্তরাখণ্ডে আমার বাস। কোচবিহার প্রীতির কথা আগেই জানিয়েছি। এই temperate zone–এর সুন্দর শহরে যাকে আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির ত্রিশ বছরে নোংরা আর ঘিঞ্জি করে ফেললেও, যথেষ্ট খারাপ করতে পারিনি। এই temperate zone-এর সুখ-সুবিধা, আরাম, উত্তরবঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তৈরি করেছে।"[৩৪] পক্ষান্তরে, অস্বীকার করতে চেয়েছেন বাংলা সাহিত্যে কলকাতাকেন্দ্রিক চর্চার ঔপনিবেশিকতাকে। তাই মগ্ন ভগীরথের মতো নিভৃত চর্চা করেছেন উত্তরবঙ্গের অরণ্য, নদী, জনজাতির জীবন ও ভাষার। *হলং মানসাই উপকথা* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয় "সপ্তাহ" পত্রিকায়, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে এবং *সোঁদাল* প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয় "প্রতিক্ষণ" পত্রিকায়, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে। পরবর্তীকালে এই দু'টি উপন্যাস একত্রে প্রকাশিত হয়েছিল *এই অরণ্য এই নদী এই দেশ* গ্রন্থনামে। লেখক *হলং মানসাই উপকথায়* তার নায়িকাকে আশ্রয় দিয়েছেন অরণ্যে- "বনে বাঘ থাকেই, ভূত, অপদেবতা থাকতেও পারে, কিন্তু খারাপ মানুষ নাই, এ শুনেই যেন চোখের জল মুছে মুখ তুলেছিল চন্দানি।"[৩৫] কিন্তু

খারাপ লোভী মানুষ আসে, বন দ্রুত কমতে থাকে। *সোঁদাল* উপন্যাসে রাভাদের সাংস্কৃতিক সংকটকে তুলে ধরেছেন অরণ্য প্রসঙ্গে। রাভা পুরুষেরা রাভা নারীর ধান জমি চাষ ও রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন চলে যায় বনে, সেখানে আশ্রয় পায়, শিকারে খুঁজে পায় আপন পৌরুষ। কিন্তু অরণ্যের ক্ষীণ হয়ে আসা তাদের সেই আশ্রয়ে আঘাত করে, অরণ্যের পরিচিত পথ খুঁজে পেতে হয় নদীর পথ ধরে ধরে। অরণ্যনির্ভর আদিবাসীদের ক্রমঅস্তিত্বহীনতাকে তুলে আনলেন এভাবে- "বৃষ্টি নামে নামে মনে হয়, এমন মেঘের আকারের বন নয়, আর তার ফলে আরও নানা রকমের পরিবর্তন হবে, হচ্ছেও তা। যেমন, এটা না হয় রাজ্য যার সীমা ছিল; সেই সীমার বাইরেও অরণ্য ছিল। সেই অরণ্যগুলোর মধ্যে অরণ্যকে গোলগোল কেটে নিয়েই তো চা বাগান। সেইসব অরণ্যের অধিবাসীরা ভয়ে ভয়ে দূরে চলে গেল, হাতি, বাঘ, গণ্ডার, মোষ, মানুষ। কিন্তু ধরাও পড়ে, পোষও মানে। সেই চা-বাগানগুলোতে কোচ, মেচ, রাভা, রাজবংশী, নেপালি, মুণ্ডা সব মিলে একটা পোষা মানুষজাতি তৈরি হচ্ছে, হয়েছে।"[৩৬] কিন্তু, বনের প্রান্তে বা গহন বনের মধ্যে যে অসুর জনগোষ্ঠী বাস করত, তারা ক্রমে সরতে সরতে প্রায় হারিয়ে গেছে। তেমনই হারিয়ে গেছে বুনো মোষের দল। বনের জন্তু এবং বনের মানুষ- দুইই নিজেদের স্বাধীনতা, স্বতন্ত্র সত্তা, আরণ্যক জীবন হারিয়ে লাঙ্গল টানা পোষা মোষ এবং চা-বাগানের মজুরে পরিণত হয়েছে। এই আরণ্যক জীবন হারিয়ে চা-মজুরে পরিণত হওয়ার সময়ের অভিঘাতের ইতিবৃত্ত নয় শুধু, এই আর্থ-সামাজিক অভিঘাত থেকে অস্তিত্বের বিপন্নতায় পৌঁছে যাওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসের ইঙ্গিত তুলে আনলেন লেখক। বন্য মহিষের বিপন্ন অস্তিত্বের সঙ্গে আসলে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন অরণ্যনির্ভর মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বকে, *মহিষকুড়ার উপকথায়* সেই বিপন্ন অস্তিত্বের কথা তিনি পূর্বেই শুনিয়েছিলেন। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। মানবসভ্যতার নিষ্ঠুর আগ্রাসনের বলি অরণ্যজীবন। এই উপন্যাসে ১৯৫০-৫২-তে কোচবিহার শহরে রাজার বাইসন শিকার

সেই শেষের শুরুরূপে প্রতীকায়িত। আগেকার দিনে রাজারদের বিলাসিতার শিকারে অরণ্যজীবন নিধন নয়, উক্ত ঘটনা অরণ্যের ক্রমহ্রাসমানতাকে প্রমাণ করে। অরণ্যের ক্রমহ্রাসমানতায় মানুষের মতো অরণ্যের জন্তুরাও ভুল করে শহরে এসে পড়ে, জনগোষ্ঠীর আপন সাংস্কৃতিক পরিচয় বিপন্ন হয় এবং জন্তুদের স্বাধীন জীবন বা জীবন। মানুষের পৃথিবীতে অনেকটা তেলেনাপোতার মতো মহিষকুড়া এক নগণ্য গ্রাম। অরণ্যের মাঝে গড়ে ওঠা এই গ্রামের জীবন আপাত স্থির। অরণ্যের জমি গ্রাস করে বসতি গড়ে উঠেছে, চাষের জমি তৈরি হয়েছে। ঔপন্যাসিক কৃষিসভ্যতার অমোঘকতাকে প্রশ্নহীন করলেন না, বরং কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার আগ্রাসনে অনার্য অরণ্যসভ্যতার বিপন্নতা ও পশ্চাদপসারণ দেখালেন। বললেন- "কারণ যারা বনের বুকে ফুটন্ত কালো গরম পিচ ঢেলে সড়ক তৈরি করে আর যারা লাঙলের পিছনে ধৈর্য করে এগোয়, তারা একই জাতের।"[৩৭] অরণ্যের ওপর এই আগ্রাসন প্রবহমান, লেখক বললেন অরণ্যের বুকে কালো বেড়িতে দখলের শাসন আনল লোভী মানুষ- "তার বুকে যেন এক শত্রুরাজ্যকে শাসনে রাখতে, লোহার শিকল পরানোর মতোই বা, কালো কালো পীচের রাস্তা-সড়ক। হুড়মুড় করে বাস চলে, ঝর ঝর করে লরি-ট্রাক, কলের করাতের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে বনস্পতিরা লুটিয়ে পড়ে।"[৩৮] বহুকাল আগে মহিষকুড়া যখন শুধু নদীর নাম ছিল, তখন সেই নদীর পার হয়ে উঠত জল খেতে আসা বুনো মহিষের আড্ডার স্থান। এই মহিষদের ধরতে আসত ভ্রাম্যমান বেদিয়াদের দল। সেই ধরা থেকে বিক্রি পর্যন্ত তারা থাকত এইস্থানে, তখন থেকেই অঞ্চলটার নাম হয়ে যায় মহিষকুড়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বন্য মহিষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। মহিষকুড়ার প্রায় সব জমির মালিক জাফরুল্লার ভূমিদাস আসফাক রূপকথার মতো চাউটিয়ার কাছে শুনেছিল বছর দশেক আগে কোনো এক আশ্বিনের ভোরে এক বন্য মহিষের দেখা পাওয়ার গল্প। এই গল্পটা আসফাক আগ্রহ নিয়ে শুনেছিল, অবচেতনসত্তায় সেই বুনোমহিষের স্বাধীনতা স্বাদ বুঝি সে

আস্বাদন করেছিল। লেখক জানালেন, অরণ্যের ওপর আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার পরিসর ক্রমেই কমেছে- মানুষের, পশুপাখির। কারোর না কারোর হাতে চলে গেছে জমি-জঙ্গলের অধিকার। বুনো মহিষের মতো স্বাধীনতার আহ্বান বুকের মধ্যে ডেকে উঠতে পারে, কিন্তু ঔপন্যাসিক মনে করিয়ে দেন "এদিকে বুনো মোষ নিশ্চিহ্ন"।[৩৯]

মহিষকুড়ার উপকথার প্রায় ২১-২২ বছর আগে *দুখিয়ার কুঠি* লিখেছিলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার শারদীয়া "গণবার্তা" পত্রিকায়, ১৩৬৪ সালে। *মহিষকুড়ার উপকথায়* অরণ্যের ওপর নেমে আসা আগ্রাসনকে তুলে ধরেছেন, তুলে ধরেছেন অরণ্য নিধন যজ্ঞের ফলেই জেগে ওঠে আকাঙ্ক্ষিত কৃষি জমি। জমি গ্রাস করে অরণ্যকে। তেমনই তার অনেক আগে *দুখিয়ার কুঠিতে* দেখিয়েছেন সভ্যতার আগ্রাসনের শিকার হয় কৃষিজমিও। কৃষিনির্ভর জীবনের বিপন্নতার ছবি ফুটে ওঠে এখানে। উপন্যাসে দেখি ভাটিয়াদের সঙ্গে একই সমাজে আদিবাসী মাতালু, কাঁকরুরা বাস করে। ভাটিয়াদের মেয়ে মালতীর প্রতি প্রচ্ছন্ন ভালোলাগা আছে মাতালুর। অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের দেওয়া নাম দুখজাগানিয়ার কুঠি ক্রমেই দুখিয়ার কুঠি। মালতীর অনুরোধে তার ছোড়দাকে ডাকতে গিয়ে মাতালুর প্রথম চোখে পড়েছিল অস্বাভাবিকত্বটা, সে দেখেছিল কাঁচা ধানের শিষের ওপর মাটির স্তূপ। দেখেছিল নতুন তৈরি হওয়া রাস্তা পুরোনো পথ ধরেনি। মাতালুর মনে হয়েছিল এই নতুন রাস্তার ভঙ্গি উদ্ধত। ঔপন্যাসিক লিখলেন- "নতুন সড়ক পুরনো পথ ধ'রে চলছে না। এ দু'টির চালই যেন আলাদা। পুরনো পথ চলত এঁকে বেঁকে, দু'পাশের জমিকে বাঁচিয়ে। জমির শস্য-বহন যে করবে, সে কর্তব্য পালন করাই যার পরম গৌরব, সে জমিকে খাতির না-ক'রে পারে না। কিন্তু নতুন সড়ক সোজা ধেয়ে চলেছে। তার গতি দেখে তার মতি বোঝা যায় না। মনে হয় আর যে উদ্দেশ্যই তার থাক, সেটা জমি এবং ফসলকে খাতির করা নয়।"[৪০] বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, সড়কের প্রয়োজন আর শুধু কৃষির

প্রসারণের ইতিবাচক ভূমিকাতে সীমাবদ্ধ নেই। মাতালু যার অশনিসংকেত দেখেছিল কাঁচা ধান শিষের দ'লে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়ার মধ্যে, তা সত্যি হয়ে উঠল বন্ধু কাঁকরুর জীবনে। নতুন সড়কের কালো নদী কাঁকরু এবং আরও কৃষকের জীবনে জমি হারিয়ে অনিশ্চিত অন্ধকার নামিয়ে এনেছিল। একের পর এক গ্রামের বুকে জমি হারানোর বেদনা জাগিয়ে তুলে রোলার ইঞ্জিনের তীব্র হুঙ্কারে দুখিয়ার কুঠির কৃষকদের বুকে তীব্র অস্বস্তি এনে দুখিয়ার কুঠির দোরগোড়ায় হাজির হয় কালো সড়ক। কাঁকরু দেখে তার প্রায় পেকে আসা ধানের হলুদ ক্ষেতে অপরিচিত মানুষের দল। কাঁকরুর অবস্থা লেখক বর্ণনা করলেন এইভাবে- "আর দশদিনে ধান কাটতে হবে। এ সময়ে জোরে বাতাস বইলে চাষীর প্রাণ ধক্ ধক্ করে ধান ঝ'রে যাবে ব'লে। গ্রামের গোরু-বাছুরগুলিকে যৌথ চেষ্টায় ক্ষেত থেকে দূরে রাখে তারা। মানুষ ঢোকে না জমিতে পাছে গায়ে লেগে ধান ঝরে যায়। সেই জমিতে কিনা মানুষ!"[৪১] প্রায় পাকা ধানের জমির ওপর দিয়ে চলে যাওয়া মাপের দড়ি ছিঁড়ে দিতে উদ্যত হয় কাঁকরু। আরও ফসলহারা কৃষক এগিয়ে আসে কাঁকরুর সমর্থনে। কিন্তু তারা জমি মাপতে, সড়ক বানাতে আসা মজুরের তুলনায় সংখ্যায় অল্প। আর্থ-সামাজিক অবস্থানের নিরিখে উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য নেই, যে আজ শ্রমিক কাল হয়তো চাষি ছিল অথবা যে আজ কৃষক, আগামীতে হয়তো জমি হারিয়ে কুলি-কামিনে পরিণত হবে; অথচ শাসক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক চালে ও শ্রেণিসচেতনতাহীনতায় একে অপরের মুখোমুখি। অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষের আশঙ্কায় চাষিরা মাঠ থেকে কাঁচা ধানই কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, কাঁকরুও। উন্নয়নের কালো সড়ক কারোর বেশি, কারোর কম জমি গ্রাস করেছে, কাঁকরুর ছয়–সাত বিঘার প্রায় অনেকটাই- "সড়কের গতিপথের তলে তার ভাগ্য এবং জমির অধিকাংশ চাপা পড়েছে। কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়া ভুক্তাবশেষের মতো সড়কের দু'পারে এখানে এক কাঠা ওখানে আধ কাঠা জমি হয়তো-বা সে খুঁজে পেতে পারে। এই গ্রামে

কাঁকরু ভূমিহীন হয়ে গেল। তার কথায় লোকের আবার সেটেলমেন্টের কথাই মনে পড়ে। অরণ্য থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার সে সুযোগ আর নেই যে ভূমিহীন নিজের বাহু দুটিকে ভরসা ক'রে আশ্বাস পাবে।"[৪২] মাতালু তাকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেওয়ায় অপূর্ব সহজভঙ্গিতে জমিকে সহধর্মিণীর সঙ্গে তুলনা করে জমির মূল্য ও মর্যাদাকে প্রকাশ করে। কাঁকরু জমির বদলে জমি পায়নি, তার প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যাঘাত নেমে এসেছে, আহার স্বাচ্ছন্দ্যহীন হয়েছে, বাচ্চাদের জন্য রাখা দুধ বিক্রি করতে হয়েছে। তবু সামান্য বাঁটুল দিয়ে ওভারসিয়ারের চোখ-মুখে আঘাত করা ছাড়া তীব্র প্রতিবাদ সে করতে পারেনি। চাকরি পেয়েছে আফিমের চোরা-কারবারিদের ধরিয়ে দেওয়ার এবং সেই কাজ করতে গিয়ে হারিয়েছে প্রিয়তম বন্ধু মাতালুকে। কৃষক কাঁকরুর জীবনে সড়ক এক চিরকালীন ক্ষত তৈরি করে দেয়, তীব্র অভিঘাতে ভেঙে যায় তার পুরাতন নিশ্চিন্ত আনন্দের জীবন; অথচ জীবনকে নিস্পৃহ নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত অমিয়ভূষণ মজুমদারের হাতে কাঁকরু চরিত্র বন্ধু মাতালুর চোরাবালিতে ডুবে যাওয়ার জন্য পরোক্ষ হত্যাকারীর ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়নি, মাতালুর মাকেও মাতালুর মৃত্যুর খবর দেয়নি- "একটু যেন ক্লান্তি নামছে কাঁকরুর রক্তে, একটা স্নিগ্ধ বেদনার কান্না যেন তার রক্তপ্রবাহে মিশতে শুরু করেছে।"[৪৩] বলেছে মাতালু পালিয়েছে। জীবনের ওপর নেমে আসা এই চরম বিপর্যয়কে হয়তো শেষপর্যন্ত এভাবেই গ্রহণ করে নিয়েছে সে।

দার্জিলিং ও ডুয়ার্স অঞ্চলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত ব্রিটিশ চা-বাগানের মালিকেরা ছোটোনাগপুর অঞ্চল থেকে কম মজুরির মজুর সংগ্রহ করে আনে। ছোটোনাগপুরের আদিবাসীদের দিয়েই ভরে উঠেছিল উত্তরের চা-বাগানগুলো। মধ্যদেশ থেকে তারা এসেছিল বলেই হয়তো নিজেদের "মদেশিয়া" বলে থাকে। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত *বাসভূমি* উপন্যাসে সমরেশ মজুমদার এই মদেশিয়াদের আর্থ-সামাজিক জীবন ও সংগ্রামকে দেখিয়েছেন স্বাধীন ভারতের

পটভূমিতে। ছোটোনাগপুর থেকে খিদের তাগিদে, জীবন–জীবিকার তাগিদে একদিন উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে চলে এসেও বৃদ্ধ শুকরার মধ্যে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য তীব্র আকুতি দেখা যায় উপন্যাসে। তাদের কিষান জীবন থেকে উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের মজুর হয়ে ওঠার কাহিনি, প্রব্রজনের ইতিবৃত্ত শোনা যায় শুকরার মুখে। চক্রধরপুর ও রাঁচির মধ্যবর্তী টেবুয়াতে জন্ম শুকরার। জমি থেকে যেটুকু উপার্জন হত, তাতে সংসার চলত না। আড়কাঠিদের দেখানো লোভে আরও কুড়ি-পঁচিশ জনের সঙ্গে শুকরাও চলে এসেছিল চা-বাগানে। সে স্বীকার করে- "এক টাকায় তখন একমন চাল পাওয়া যেত। ওরা বলল তিন টাকা মাইনে দেবে। বুকের মধ্যে লোভ জন্ম নিল। ভাল খাওয়ার লোভ। মা-বাপকে খাওয়ানোর লোভ।"[৪৪] সেই সময় নির্জন, ম্যালেরিয়াপ্রবণ, সাহেবের অত্যাচারের চা-বাগান ও নির্যাতিত মজুরদের অতীত ইতিহাসও সে তুলে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে তুলে এনেছে চা-বাগানের আদিবাসী কামিনদের প্রতি সাহেবদের যৌননির্যাতন ও মিশনারিদের ধর্মীয় আগ্রাসন। চা-বাগানের বড়ো সাহেবের হুকুমে ওরা সবাই লাইন দিয়ে খ্রিস্টান হয়ে যায়। রবিবার গির্জায় ধর্মীয় প্রার্থনায় গেলে পাওয়া যেত রুটি আর গুড়। ওদের খ্রিস্টান নামকরণও হয়। শুকরা অবশ্য তার খ্রিস্টান নাম কখনও ব্যবহার করেনি।

চার কুড়ি বছর পার করেও শুকরা বারবার বলেছে- "এই দেশটা আমাদের দেশ নয়।"[৪৫] বোঝাতে চেয়েছে নেপালি, ভুটিয়া, লেপচাদের মতো তাদের চেহারার আদল নয়, রঙ নয়। অবয়ব ও গায়ের রঙ সবই ছোটোনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের মতো। তাই তার সেই চেনা পুরাতন জন্মভূমিতে মৃত্যুর আগে ফিরে যেতে চেয়েছে। অবশ্য এ আবেগ বোঝেনি ছেলে-নাতিরা। নাতি সিরিলের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন ভারতে চা-বাগানে কাজ করা মজুরদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে রূপায়িত করলেন লেখক। সিরিলরা ইউনিয়ন তৈরি করে, যদিও সেই ইউনিয়নের মাথার

ওপর বসে থাকে ক্ষমতালোভী মানুষেরা, তবু কোম্পানির বিরুদ্ধে এই ইউনিয়ন ধর্মঘটের মতো পদক্ষেপ নিতে পারে। দাবি বিশ শতাংশ বোনাস। কোম্পানি দিচ্ছে আট শতাংশ, কিন্তু তা মেনে নিতে নারাজ সিরিলদের নেতৃত্বে চা-শ্রমিকরা। সিরিলের সঙ্গে শুকরার ও সিরিলের সঙ্গে ছোটো সাহেবের কথোপকথনে বোঝা যায় সিরিলের মনের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিষয়ে সচেতনতা দেখা দিয়েছে। শুকরা নিজেদের বাবুদের মতো "ভদ্রলোক" মানতে নারাজ, কোম্পানির বাবুরাও তাই। ছোটো সাহেবকে অবশ্য সিরিল স্পষ্ট করে সমাজের শ্রেণিগত বৈষম্য সম্পর্কে- "তারপর বলল, 'ফ্রান্সিসকে দেখেছিস? যেই শালা বাবু হয়ে গেল অমনি আমাদের কুলি ভাবতে লাগল। কোনও বাবু আমাদের মানুষ বলে মানে না। সাহেবরা তো সবসময় ভাবে আমরা ওদের কেনা গোলাম।"[৪৬] ফলে, কোম্পানির সঙ্গে বোনাসের দাবির লড়াইটা, বাবুদের বিরুদ্ধে লড়াইটা আর্থ-সামাজিক সচেতনতা থেকে উঠে আসে। স্লোগান ওঠে- "ইয়ে বাগান হামারা হ্যায়-মালিকের লাভ আমাদেরও লাভ।"[৪৭] বাবা মাংরা ও দাদু শুকরা চা-বাগানে মালিকের এক পাক্ষিক ক্ষমতাকে নাকচ করে দিয়ে হরতাল সফল হয়। অবশ্য বিশেষ লাভ হয় না। আট শতাংশ বেড়ে বোনাস দশ শতাংশে পৌঁছায়, কুড়িতে নয়। ধর্মঘট চলাকালীন, চা-বাগান বন্ধ থাকাকালীন তীব্র দারিদ্র্যে মজুরদের কেউ কেউ চা-পাতা অবৈধ উপায়ে বেচবার চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত দেখা যায় মালিকের কুড়ি দিনের হরতালের জন্য বন্ধ থাকা কাজ তারা সকলে মিলিত পরিশ্রমে বাকি দশদিনে করে দেয়। চা-বাগানকে নিজের বলার স্লোগান বাস্তবে প্রমাণ করতে পারে বলেই শুকরাও শেষপর্যন্ত চা-বাগানকে নিজের ভূমি জেনেই মারা যায়। বাসভূমি জন্মভূমি হয়ে ওঠে, আর স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে মজুরের অবস্থা ও অবস্থান স্বাধীনতা উত্তরের আর্থ-সামাজিক সচেতনতায় এসে পাল্টে যায়।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে চব্বিশ পরগণার (বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগণা) ভাগচাষি ওঁরাও সমাজের প্রায় কুড়ি বছরের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস সাধন চট্টোপাধ্যায়ের *উদ্যোগ পর্ব* (১৯৮২)। ১৯৫০-এর মাঝামাঝি সময় থেকে নকশাল আন্দোলনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পানশিলার ভাগচাষি গঙ্গা ওঁরাও তথা ওঁরাও জীবনের বাস্তব চেহারা, পরিবর্তন তথা ভাঙা-গড়াই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। উপন্যাসের সূচনায় দেখি পশ্চিমবঙ্গের বুকে তখনও ক্ষতের মতো লেগে রয়েছে দেশভাগ। দেশভাগজনিত ছিন্নমূলেরা এপার বাংলায় এসে বসতি গড়ছে বনে-বাদাড়ে, জলাভূমিতে। এই পরিস্থিতিতে বারাসাত অঞ্চলের ওঁরাওদের পরিচয় দিলেন লেখক এইভাবে- "এই ভৌগোলিক পরিবেশে, অন্ধকার ছায়ায় জীবনের স্রোত বইতে ছ-সাতটি মৌজা অধিকারকরা জন বারো জমিদার এবং তাদের দাপটের তলে বেশ কিছু ঘর ওঁরাও চাষির।"[৪৮] কোনো এক বিস্মৃত সময়ে ছোটোনাগপুর ছেড়ে এদের পূর্বপুরুষেরা চলে এসেছিল চব্বিশ পরগণার জলা-জঙ্গলে, তারপর জঙ্গল কেটে জমি বসবাস ও চাষের উপযোগী করে তুলেছিল। ওঁরাওদের বাসস্থান সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায় বলেছেন- "রাঁচি জেলা ভারতবর্ষের আদিম জাতিসমূহের একটি প্রধান আবাসভূমি। ওঁরাও দ্রাবিড়জাতির অন্তর্ভুক্ত, সংখ্যায় ইহারা আদিম জাতিদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, বিশিষ্টতায় ইহাদের স্থান মুণ্ডাদিগের পরেই।"[৪৯] শিকড়ের ইতিহাস যাই হোক না কেন, পানশিলা গ্রামের ওঁরাওদের তিন-চার পুরুষের স্বদেশ এই পানশিলা। বাংলার জল-হাওয়ায় লালিত পানশিলার ওঁরাওদের কাছে শাল মহুয়ায় ঘেরা পিতৃপুরুষের দেশ এক বিস্মৃত অতীত। ১৯৫০ থেকে শুরু করে নকশাল আন্দোলনের গোড়ার সময়কাল পর্যন্ত - উপন্যাসের এই বিস্তৃত সময়ের ক্যানভাসে উঠে এসেছে ওঁরাওদের জমিকেন্দ্রিক লড়াই ও দ্রুত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন। ঔপন্যাসিক স্বীকার করে নিয়েছেন উপন্যাসের প্রাথমিক ভাবনায় নাম ছিল *মাটি ও মানুষ*। পরে আরও গাঢ়তর ব্যঞ্জনায় নাম হয় *উদ্যোগ পর্ব*। ১৯৫০ সালের

বছর চার আগে ঘটা তেভাগা আন্দোলনের উত্তাপ এসে পড়েছিল পানশিলা গ্রামেও। জমিদার ধীরেন ঘোষকে তিন ভাগের আইনের হুমকি দেওয়ায় মরতে হয়েছিল চতুরা ওঁরাওকে। চতুরার মৃতদেহটা পাওয়া গেছিল ঘটনার পরেরদিন, বিলের ধারে। এইভাবে উদ্ধতকে কড়া শাসন রেখে তেভাগার ভরা জোয়ারেও কোনও আধিয়ারকে মাথা তুলতে দেয়নি জমিদার ঘোষেরা। দেশভাগের পর ওঁরাও ও কেওড়াপাড়ার কাছেই গড়ে উঠেছিল বাঙালি উদ্বাস্তু কলোনি। সংস্কারাচ্ছন্ন ওঁরাও সমাজের দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধের মধ্যেই শেষপর্যন্ত উদ্বাস্তু শিক্ষিত যুবক বিজয়ের উদ্যোগে গঙ্গা ওঁরাও-এর বাড়ির উঠোনে স্কুল বসে। জীবনের এই নতুনত্বের স্বাদের মধ্যেই এসে পড়ে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন ও তার প্রত্যাঘাত। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৫৩ সালে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন পাশ হয়। ওই আইনে বলা হয়, এযাবৎকালের জমিদারের প্রজারা রাষ্ট্রের প্রজা বলে গণ্য হবে এবং জমিদাররা সর্বোচ্চ ২৫ একর কৃষিজমি ও ১৫ একর অকৃষিজমি রাখতে পারবে। অতিরিক্ত জমির অধিকার ও খাজনা আদায়ের ক্ষমতা চলে যাবে সরকারের হাতে। ফলে, এইসময় জমি বিক্রি করে এককালীন টাকা ঘরে ঢোকাতে চেয়েছিল তৎকালীন কিছু অসৎ জমিদার। বাদল ওঁরাও-এর তিন পুরুষের বসবাসের জমি জমিদার বিক্রি করে দেয় ওপার বাংলা থেকে আগত ডাক্তারকে। শুধু তাই নয়, বেনামে জমি রাখার বন্দোবস্তও শুরু হয়। এই বেনামে জমিব্যবস্থার দিকটি ঔপন্যাসিক তুলে ধরলেন এইভাবে- “জমিদারী প্রথা বিলোপ হয়ে গেছে সত্যি- অন্ততঃ আইনের চোখে- কিন্তু জমি বা ফসল হাত-পা গজিয়ে ভূমিহীন বা আঁধিয়ারদের ঘরে চলে যেতে পারে না। সেখানে যার লাঠি তার মাটি! লাঠিকে জিজ্ঞেস কর তুমি কার? উত্তর পাবে পয়সার। অন্ততঃ ঘোষপাড়ার কিছু পরিবার তাই মনে করে। তাছাড়া আইনের প্রতি তারা সশ্রদ্ধ। আইনের সর্বোচ্চ সীমা কত বেঁধে দিয়েছে? নিকুঞ্জ বা ফণি ঘোষ তাতো লঙ্ঘন করেনি। এত জমির মালিক কি তারা নিজে? মোটেই না। ছেলে আছে, মেয়ে-বউ-ঝি,

গরু-ছাগল-বিড়াল, এমনকি অনাগত সন্তান ভ্রূণাবস্থায় থাকলেও বা কি- জগতের আলো তো দেখবে একদিন; তার নামেও জমির মালিকানা দেয়া আছে। সুতরাং ওঁরাওদের এ-অন্যায় ঔদ্ধত্যপূর্ণ সংগঠন বেআইনি।"[৫০] শুধু বাদল ওঁরাও-এর তিন পুরুষের জমির স্বত্ব অন্যায়ভাবে অন্য কাউকে বিক্রি করে দেওয়া নয়, বাকি ওঁরাওরা জমি থেকে উদ্‌খাত হওয়ার যে আশঙ্কা করেছিল, একের পর এক এইধরনের ঘটনায় সেই আশঙ্কা সত্যি হতে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে ভাগচাষিদের স্বার্থে বর্গাদারি আইন চালু হয়েছিল বটে, কিন্তু সরকারি ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রকৃত বর্গাদারদের নাম সরকারি খাতায় নথিভুক্ত হয় না। বদলে ভয় দেখিয়ে বা ছলনা করে ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষিদের উচ্ছেদ চলে। কৃষক স্বার্থে বর্গাদারি আইনের প্রসঙ্গ তুললে বা অধিকারের দাবি জানালে গঙ্গা ওঁরাওদের বিশ বছরের চাষের অধিকার ছলনা করে কেড়ে নেয় ফণি ঘোষ। গঙ্গার বাবা অশিক্ষিত বদরু ওঁরাওকে দিয়ে ভুল বুঝিয়ে টিপ ছাপ করিয়ে নেয় ফণি ঘোষ। বর্গাদার উচ্ছেদের শিকার শুধু গঙ্গা ওঁরাও নয়, কেষ্টপুর মৌজায় প্রকৃত বর্গাদারদের নাম বাদ দেয় সরকারি লোকই, ঘুষের বিনিময়ে। বর্গাদারের অধিকার রক্ষার সূত্র ধরেই গঙ্গা ওঁরাও-এর রাজনৈতিক উত্থান, ওঁরাওদের নিয়ে কৃষক সমিতি গঠন ও কৃষিকেন্দ্রিক বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। স্বাধীনতা-উত্তরকালে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে পানশিলার ওঁরাওদের আর্থ-সামাজিক জীবনে বহু অভিঘাত এসেছে। একদিকে জোতদারদের পক্ষে বিপক্ষের প্রশ্নে যেমন ওঁরাও সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, তেমনই আবার প্রতিবেশী কেওড়াপাড়ার দুলালের জমির অন্যায় দখলের বিরুদ্ধে গঙ্গারা একজোট হয়ে তাদের পাশে থেকেছে। রক্ষণশীলতা ও আনুগত্য এবং প্রগতিশীলতা ও প্রতিরোধের দ্বন্দ্বের মধ্যেই গোলকের গাড়ির ধাক্কায় ওঁরাও সমাজের প্রাচীনতম

ব্যক্তিটির, একশো পাঁচ বছরের ভোলা ওঁরাও-এর মৃত্যু হয়। দোষী গোলকের শাস্তি হয় না, শুধু ওঁরাও পাড়ায় একটা যুগের অবসান হয়ে যায়।

সরকার প্রথম নির্বাচন পরবর্তী সময়কালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় গড়ে ওঠে অসংখ্য ছোটো বড়ো কারখানা। এই কারখানা নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই চাষের জমি ও জোতদারদের চাষে আগ্রহ – দুইই কমে আসে। বাতাসে ও মাটিতে শিল্পের উচ্ছিষ্টের বিষ জমির ফলনের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়- "চাষ-যোগ্য জমির পরিমাণ কমে গেল, ক্ষেত্রসংলগ্ন লোকালয়-গঠনের ফলে গরু, ছাগল এবং মানুষের দৌরাত্ম্যে ফসল গোলায় ওঠার সুযোগ পায় না, ক্রমবর্ধমান কলকারখানার ধোঁয়া, গ্যাস এবং নানাপ্রকার রাসায়নিক তরল ক্ষেতে ঢুকে মাটির উর্বরা শক্তি কমিয়ে দিল। আগে যেখানে বিঘা প্রতি দশ মণ ধান ফলত, এখন দাঁড়িয়েছে চার পাঁচ মণে। ওঁরাওরা খানিকটা মাঠের জলে থাকলেই পা ফোলে, কুট্ কুট্ করে।"[৫১] কৃষক ওঁরাওদের জীবনে, কৃষক থাকতে চাওয়া ওঁরাও জীবনে সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন ঘটে। কৃষির এই দুরবস্থায় আরও দরিদ্র হয়ে যাওয়া পানশিলা ওঁরাওরা ধীরে ধীরে কারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়। রোজ নতুন করে একজন কৃষক শ্রমিক হয়ে যায়, অথচ রক্তে থেকে যায় জমির খিদে। এভাবে সত্তায় কৃষক থাকা মানুষগুলো পেশায় শ্রমিক হয়ে আধা কৃষক-আধা শ্রমিক বনে যায়। এরই মধ্যে এসে পড়ে ১৯৫৯-এর ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন। কলকাতায় খাদ্য আন্দোলনের মিছিলে যোগ দিলে রাষ্ট্রের হাতে দুলালের মৃত্যু হয়। আসে ১৯৬২ সাল, ভারত-চীন যুদ্ধ। দেশাত্মবোধক গানে খিদেকে ঘুম পাড়ানোই তখন প্রকৃত দেশপ্রেম, আত্মত্যাগের আহ্বানের প্রতিক্রিয়ায় ভাত চাওয়া, খেতে চাওয়া অন্যায়, দেশদ্রোহিতা। মালিকদের আহ্বানে শিল্পে শান্তির চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। বলা হল জরুরি অবস্থায় কোনো ধর্মঘট, গেট মিটিং বা বিক্ষোভ চলবে না। উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে, কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হল অথচ

মজুরি বাড়ানো হল না। ছাঁটাই-নিবারণের জন্য কোনও কড়াকড়ি আইন করা হল না। ফলে, ছাঁটাই চলতে লাগল। বিশেষত প্রতিবাদী মুখদের রাখা হল না। গঙ্গাকে কারখানার কাজ থেকে বরখাস্ত করা হল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্র গঙ্গা ওঁরাওকে গ্রেপ্তার করে। ওইবছরই অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে শোধনবাদের প্রশ্নে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে যায়। দু'বছরের জেল জীবন, পার্টির ভাঙন, পানশিলা গ্রামের ওঁরাওদের দরিদ্রতর অবস্থা ও পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা গঙ্গার জীবনকে যন্ত্রণা এবং আত্মজিজ্ঞাসায় পূর্ণ করে। ওঁরাওদের কল্যাণ কামনা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় স্কুল তৈরি দিয়ে গঙ্গা ওঁরাও-এর যে রাজনৈতিক পথ চলা শুরু হয়েছিল, ওঁরাও জীবনের ছন্নছাড়া অবস্থা সেই পথ ও আদর্শের প্রতি গঙ্গাকে আর প্রশ্নহীন রাখল না। বাম নেতৃত্বের প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা ও বিশ্বাসও সে আর ধরে রাখতে পারে না। গঙ্গার এই মানসিক সংকটের সময়কালেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশজুড়ে এসে পড়ে '৬৬-এর খাদ্য আন্দোলন ও '৬৭-র নকশাল আন্দোলন। এরই মধ্যে বামফ্রন্টের শরিকীতে প্রথম অ-কংগ্রেসি যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় ও মাত্র নয়মাসের আয়ু নিয়ে ভেঙে পড়ে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। '৬৭-র নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান গঙ্গা ওঁরাওদের জীবনে নতুন করে জমি ও ধানের স্বপ্নকে উজ্জীবিত করে। ওঁরাওদের কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকার ইতিহাস সম্পর্কে সমালোচক জানিয়েছিলেন- "ছোটনাগপুরের ওঁরাওরা জীবিকার জন্য কৃষিকার্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে; তাই তাহাদের প্রত্যেক পূজা, পার্বণ, প্রত্যেক উৎসব, এমনকি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পর্যন্ত সমস্তই, এমনই ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পাড়া যায় যে, তাহারা ফল আকাঙ্ক্ষা করে একটি – প্রচুর শস্যোপাদন।"[৫২] কৃষিকাজের সঙ্গে উৎসব-পার্বণের যুক্ত হয়ে যাওয়া ওঁরাওদের কৃষিজীবনের সঙ্গে একাত্মতাকেই প্রকাশ করে, যা উপন্যাসেও নানাবিধ ঘটনাপ্রবাহ ও গঙ্গার অনুভব ও অভিব্যক্তির দ্বারা স্পষ্ট।

নকশাল আন্দোলনের জন্মমুহূর্তে ওঁরাওদের চিরকালীন জমির আকাঙ্ক্ষা শেষপর্যন্ত জমি ও ফসল দখলের সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিব্যপ্ত হয় এবং আরেক পালাবদলের আভাসে উপন্যাসে পরিসমাপ্তি ঘটে। *মহাভারতের* "উদ্যোগ পর্ব" আসলে মাটির অধিকারে লড়াই বা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব। এই উপন্যাসেও দেখি মাটির অধিকারের, জমির অধিকারের লড়াই ও ধর্ম-অধর্মের লড়াই-এর সূচনার আভাস উপন্যাসের শেষে আর সমগ্র উপন্যাসজুড়ে তারই প্রস্তুতি, উদ্যোগ। আর এই প্রস্তুতিপর্বজুড়ে লেখক ওঁরাও জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং আর্থ-সামাজিক পালাবদলকে পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরলেন বাস্তবসত্যনিষ্ঠায়।

সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে লেখা *আকরিক* (১৯৮৪) উপন্যাসের পটভূমি সম্পর্কে সৈকত রক্ষিত বলেছেন- "আকরিক' লেখার আগে আগে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল পুরুলিয়া জেলার ঝালদার কাছে একটি সিমেন্ট কারখানা হবে। সিমেন্ট তৈরির জন্য দরকার উন্নত মানের স্ল্যাকেড লাইম বা চুনাপাথর, যা বিস্তর পরিমাণে রয়েছে ব্রজপুর-হেঁসাহাতু অঞ্চলে।...সে সময়ে আমি পড়ে থাকতাম সেখানেই।"[৫৩] চুনাপাথর, চায়না ক্লে ও সুবর্ণরেখার ওপর ড্যাম নির্মাণকে কেন্দ্র করে পুরুলিয়ার হেঁসাহাতু-কল্‌মা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আর্থিক শোষণ ও রাষ্ট্রিক বঞ্চনার ছবি তুলে ধরেছেন লেখক।

স্বল্পায়তনের এই উপন্যাসটি শুরু হয়েছে সাঁওতালদের দারিদ্র্য ও খাদ্যাভ্যাসের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে, যেখানে ভৌগোলিক বিশ্বস্ততায় লেখক তুলে এনেছেন অধিবাসীদের মুখের ভাষাও- "মা ঞেলিঞ মে! মা ঞেলিঞ মে!"[৫৪] অর্থাৎ আমাকে দেখো। নাটকের দৃশ্যের মতো পোড়া তেঁতুল দানার রঙের উদোম শরীর ও চওড়া বুকের সাঁওতাল যুবকের সাপ শিকারের উল্লাস দিয়ে উপন্যাসের সূচনা। এই সূচনা

পুরুলিয়ার এই আদিবাসী অধিবাসীদের দারিদ্র্য ও খাদ্যাভ্যাসকে একত্রে প্রকাশ করে। উপন্যাসের মূল অংশে প্রবেশের আগে লেখক এই হেঁসাহাতু-কল্‌মা অঞ্চলের ইতিহাস ও ভূগোলের খবর দিলেন। ঝালদা থেকে হাজারিবাগ পর্যন্ত মূল সড়কের ডানপাশে মাহাতমারা গ্রাম, কল্‌মা অঞ্চল। এই মাহাতমারা গ্রাম থেকে ব্রজপুর হয়ে খানিকটা এগোলে ডাকা-গাড়্‌হা নদী। খালের মত শীর্ণকায়া এই নদীতে ব্রিটিশ যুগের ডাক-পিয়নেরা আঁচলা ভরে জল খেয়ে নিত, সেই থেকে নদীর নাম ডাক-গাড়্‌হা। মাহাতমারা থেকে এই নদী পর্যন্ত হেঁসাহাতু অঞ্চল। এই হেঁসাহাতু গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে থাকা অধিকারী ডি মৌজায় আর কোনো বসতি নেই, অথচ একসময়ে ছিল। ছিল দশ-বিশ ঘর নিরীহ বাইদ্যা ও কয়েকঘর দুষ্ট খাইড়ার বাস। মাঝে মাঝেই নেশা করে খাইড়ার দল সাঁওতাল কুলহিতে চড়াও হয়ে অত্যাচার চালাত। অত্যাচারের মাত্রা পরিমাপ করা যায় যখন লেখক তুলে ধরেন খাইড়াদের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে সাঁওতাল বসতির বারো বছরের কিশোরীরাও সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়েছিল। এই যৌন নির্যাতন দীর্ঘদিন মুখ বুজে সহ্য করেনি সাঁওতালরা, একসময় তারা সশস্ত্র প্রতিবাদও করে। এই মিলিত প্রতিরোধ ও মারামারি-লাঠালাঠির জেরে খাইড়ারা শেষপর্যন্ত এলাকা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। যে লড়াইয়ের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে লেখক উপন্যাসের সুর বাঁধলেন, সেই সুরের উঁচু তারে দেখালেন পরবর্তীকালে এই বর্বর উপজাতিদের বিরুদ্ধে নয়, সাঁওতালদের লড়তে হয়েছিল নিদারুণ দারিদ্র্য ও খিদের সঙ্গে। প্রচণ্ড ক্ষুধায় মহুয়ার ফল খেয়ে খিদে ভুলে থাকার স্বপ্রতারণায় আসলে ক্রমে যে ক্ষোভ ও আক্রোশ নিরন্তর জমা হতে থাকে, পুঞ্জিভূত হয় - লেখক জানান এই উপন্যাস সেই আক্রোশ ও আর্তনাদের কাহিনি।

প্রান্তবর্গের এই আর্তনাদের কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে আছে দীর্ঘদিনের নিরন্তর বঞ্চনা ও অবহেলার ইতিবৃত্ত। চুনাপাথরের হদিশ পেয়ে এসে জোটে ঠিকাদারের দল। পাথর ভাঙা, ডিনামাইট ভরে

দেওয়ার মতো সবল, সাহসি অথচ সস্তায় মজুর ভরপেট খেতে না পাওয়া এই আদিবাসী ভিন্ন আর কারাই বা হতে পারত! শুধু চুনাপাথরের পাহাড় নয়, পুরুলিয়ার মাটির তলায় রয়েছে চায়না ক্লে। চায়না ক্লে পেতে ঠিকাদারের প্রয়োজন মাটির অধিকার, তাই সে প্রস্তাব দেয় "ঠিকাবাবু তাদের জমির পুরানা দলিল-পঁড়চা বার করতে বলে। আসলে ঠিকাবাবু বলতে খুজছে, 'তুমাদে জমি আমাকে বিক্রি কর। আর তুমরা আমার ল্যাবার হিসাবে থাইকে যাও।"[৫৫] প্রাজ্ঞ কালীকিস্টর (কালীকৃষ্ণ) অসম্মতি সত্ত্বেও সামান্য স্বচ্ছলতার স্বপ্নে জমি বিক্রির কাগজে টিপছাপ দেয় বাকিরা। খবর চাউর হতে সরকার থেকে শুধু অন্যায় জমি অধিগ্রহণই নয়, বন্ধ করে দেয় জমির মাটি খোঁড়া ও চায়না ক্লে তোলাও। রুক্ষ জমিতে যেটুকু শস্য উৎপাদন হত, চায়না ক্লে তুলতে খোঁড়ার ফলে সেই জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ল। কৃষিজীবী মানুষগুলো খেত হারিয়ে জমি খোঁড়ার মজুর হয়েছিল। এখন দুটোই হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। বিপরীতে, সরকারও এই মানুষগুলোর অসহায় অবস্থায়, অভুক্ত অবস্থায় কোনো সাহায্যের আশ্বাস দেয় না।

লেখক পুরুলিয়ার জলের অভাব ও গরমের সময়ে খরার কথা টেনে এনেছেন সুবর্ণরেখার ওপর ড্যামের প্রস্তাবের সূত্র ধরে। হেঁসাহাতুর লোক যখন বছরে একবার নামমাত্র ধান চাষ করে চুনাপাথরের কাজে চলে যায়, তখন কল্‌মা অঞ্চলের লোক মাটির তিরিশ-পঁয়তাল্লিশ ফুট নীচের জল তুলে সারা বছর কিছু কিছু চাষের চেষ্টা করে যায়। ফলে, সুবর্ণরেখায় ড্যাম হলে, কল্‌মা অঞ্চল জল পেলে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক দেখাশোনা ও মানুষের আর্থিক অবস্থার বিপুল পরিবর্তন হবে। সরকার শেষ পর্যন্ত সুবর্ণরেখায় বাঁধে সম্মত হয়, কিন্তু জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এলাকার মানুষজনেদের ক্ষতিপূরণের দাবিকে স্বীকার করে না। পুরোনো রেটেই জমি নিতে চায়। শুধু তাই নয়, এলাকার বিক্ষুব্ধ, অসম্মত অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনাতেও বসে না। কার্যত রাষ্ট্রিক শক্তি ও ক্ষমতাই

প্রদর্শিত হয়। সরকারের ঠিকাদার মাটি খোঁড়া ও তোলার কাজ শুরু করে দেয়। সরকারের ঠিকাদারের বিরুদ্ধে, সরকারি জোরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয় বুধা পাল। বিরুদ্ধ মতও যে ছিল না, তা নয়। ড্যামের জল এলে খরা থাকবে না, জলের অভাব মিটবে বলে মনে করেছিল অনেকেই। কিন্তু ক্ষেতের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে শেষপর্যন্ত তারা অনড় থাকে। তারা লড়াই করে ঐ এলাকার সব অঞ্চলের জলের দাবিতে। আর্থ-সামাজিক নিরিখে তাই *আকরিক* কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সমাজজীবনের আলেখ্য হয়ে ওঠে না, হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের অবহেলা-বঞ্চনা ও জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে আর্থিক শোষণের শিকার একটা এলাকার সব দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মানুষের কাহিনি। সৈকত রক্ষিত অর্থনীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর সব লেখাতেই। গ্রামীণ অর্থনীতি ও কারিগরি জীবনের নানা ছবি তাঁর বিভিন্ন লেখায়। *আকরিক* উপন্যাসটি সম্পূর্ণতই দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পটভূমিতে। শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, মানুষের সচেতন জাগরণের আভাসে যার পরিসমাপ্তি।

অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* (১৯৮৫) উপন্যাস যাযাবর বাজিকরদের ছয় পুরুষ ধরে স্থায়িত্ব পাবার দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। পীতেমের সময়কাল থেকে তার পৌত্রের পৌত্র শারিবার সময় পর্যন্ত, সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়কাল থেকে তেভাগা, দেশভাগ ও স্বাধীন দেশে ভোটাধিকার পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। বাজিকররা নিজেদের পরিচয় দেয় বাদিয়া বাজিকর হিসেবে, বলে- "হিন্দু-মুসলমান সমাজ আমাদের ডোম-চণ্ডালের জাত হিসেবে ধরে।"[৫৬] সমাজে তাদের শুধু যে স্থিতিই ছিল না, তা নয়; তারা ছিল অস্পৃশ্য। "শারিবার নানির কথা মনে পড়ে। নানি বলত, হামরা তো অছুতের জাত রে, শারিবা। গোরখপুরে হামরা অছুৎ ছিলাম। তার আগেৎ যেথায় ছিলাম, সেথা তো হামারদের ছেঁয়া মাড়ানো পাপ! সেথায় অছুৎ জাতকে রাস্তাৎ যাতে হলে ক্যানেস্তারা বাজায়ে যাতে হয়। লয়তো, জেতের

মানষের গায়েৎ হাওয়া লাগে, ছেঁয়া লাগে। সি বড় পাপ!”[৫৭] শারিবা বোঝেনি কোনটা পাপ! তারা অচ্ছুত হয়ে গিয়েছিল কোন পাপে! নানি লুবিনি বোঝাতে পারেনি বাজিকররা অচ্ছুত হয়ে গেল কেন! আসলে এই পাপের ধারণা, অচ্ছুতের ধারণা বানিয়ে তুলেছিল যুগ যুগ ধরে ক্ষমতার কারবারিরা। বিশ্বাসের মধ্যে গুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতাকে। বাজিগরদের মিথে সেই বানিয়ে তোলাকে, গুলিয়ে দেওয়াকে তুলে আনলেন ঔপন্যাসিক। রহু চণ্ডালের গল্পে গাঁথা আছে একদিন নদীর জলে, জমির শস্যে অধিকার ছিল বাজিকরদের। তারপর এল দখলদারের দল, বাহুর জোরে ও ক্ষত্রমদমত্ততায় নষ্ট করল শস্য, ধর্ষণ করল নারীকে আর রক্তাক্ত করল বাধাদানকারীদের। নদীর ধারে স্থাপন করল মন্দির আর ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সঙ্গতে সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করল দেবমূর্তির। হিন্দুবর্ণব্যবস্থায় বাজিকররা হয়ে গেল অস্পৃশ্য। নদীর জলে তাদের কোনো অধিকার থাকল না –

“তোমার মন্দিরে আমাদের প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই নদী এতকাল আমাদের ছিল ।

এখন আর নেই । এখন এ নদী আমাদের, তোমাদের স্পর্শে অপবিত্র হবে।”[৫৮] সেদিনের উৎখাত হওয়া বাজিকর জীবন ক্রমাগত সন্ধান করে চলেছে স্থিতি। যাযাবর হওয়া বাজিকরদের মিথে আছে দেবতার অভিশাপের প্রসঙ্গ- পুরা ও পালির অবৈধ বিবাহকে কেন্দ্র করে অভিশপ্ত হয়েছিল বাজিকররা। “পুরা ও পালি দেশ-দেশান্তরে পালিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তারা কোথাও আশ্রয় পায় না এবং দেবতা তাদের অভিশাপ দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় করে দেয়। তোমরা এক বৃক্ষের ফল দু-বার খেতে পারবে না, এক জলাশয়ের জল দু-বার পান করতে পারবে না, এক আচ্ছাদনের নিচে একাধিক রাত্রি বাস করতে পারবে না এবং সব থেকে ভয়ানক- এক মৃত্তিকায় দু-বার নৃত্য করা দূরে থাকুক, দু-বার পদপাত পর্যন্ত করতে পারবে না। এই ছিল দেবতার অভিশাপ।”[৫৯] চলমান জীবন হয়েছে বাজিকরদের নিয়তি, নাচে-গানে-ভিক্ষাবৃত্তিতে পেশাকে করেছে আবদ্ধ। বাঁদর-ভালুকের খেলা,

ভানুমতীর খেল্, দড়ির খেলা দেখিয়ে বেড়িয়েছে। সাপের খেলা তাদের নয়। রঘু তাদের কাছে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোনো এক প্রাচীন দলপতি, যে তাদের বাঁচাতে চেয়েছিল, বাজিকরদের স্থিতি চেয়েছিল। তবু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সমগোত্রীয় হয়ে ওঠেনি রহু তাদের জীবনে। বাজিকররা তাকে ঈশ্বর ভাবতে পারে না বলেই ঈশ্বরের কাছে আশ্রয়ের যে অবকাশ বাকিদের আছে, বাজিকরদের তাও নেই। শারিবা তাই নানি লুবিনির কাছে তাদের "রহু" হিন্দুর ভগবান বা মুসলমানের আল্লা বা খ্রিস্টানের যিশুর ন্যায় কিনা জানতে চাইলে লুবিনি বলে- "না শারিবা, রহু রহুই। সি হামরার মঙ্গল চায়। সি চায় বাজিকর সুখে থাকুক, থিতু হোক।"[৬০] পুরো উপন্যাসজুড়ে বাজিকরদের এই সুস্থিতির লড়াই। পীতেম থেকে শারিবা ক্রমাগত এই স্থিতির জন্য লড়ে গেছে। বাজিকরদের ছয়পুরুষের লড়াই উপন্যাসের মূল আখ্যান হলেও স্বল্প পরিসরে স্থান পেয়েছে সাঁওতালদের জমি-জীবন-জীবিকার লড়াই। কোনো এক শনিবারের ভূমিকম্পে ঘর্ঘরার তীর থেকে উৎখাত হয়ে পূর্বের দিকে দল নিয়ে সরে এসেছিল পীতেম। সে রাজমহলে গঙ্গার ধারে ছাউনি ফেলে। রাজমহল, বারহেট, তিনপাহাড়ের হাটেবাজারে খেলা দেখাতে গিয়ে বাজিকররা দেখেছিল সাঁওতালদের। পীতেমের সাঁওতালদের দেখার প্রথম অনুভবটুকু লেখক তুলে ধরলেন এইভাবে- "এই মানুষগুলো চকচকে কালো, উজ্জ্বল দাঁত তাদের, অফুরন্ত তাদের আনন্দ। পীতেম তাদের দেখেছিল বিস্ময়ের সঙ্গে। এরা বাদিয়া বাজিকরের মতো নয়, আবার এরা সাধারণ গৃহস্থের মতোও নয়। এরা পণ্ডিতও নয়, মূর্খও নয়। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম, খেটে খাওয়া মানুষ এরা। পাহাড় ভেঙে, জঙ্গল পরিষ্কার করে অবিশ্বাস্য নিষ্ঠায় তারা ফসলের জমি তৈরি করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা পরিশ্রম করে, তার পরেও গান গায় এবং নাচে, জীবনকে উপভোগ করে।"[৬১] জমির ফসল লুঠ হয়ে যায় জেনেও জমি ও শস্যের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা পীতেম দেখেছিল এদের মধ্যে। লক্ষ্মণ সোরেনের সঙ্গে পরিচয় পীতেমের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল "এক

অনাস্বাদিত আকাঙ্ক্ষার বীজ''। লক্ষ্মণ সোরেনের কাছে জেনেছে একমাত্র জমিই দিতে পারে স্থায়িত্ব। ফসলের উৎপাদন মানুষকে সন্তানসুখের অনুভূতি দেয়। পরবর্তীকালে নমনকুড়িতে চাষের কাজে পরতাপের কঠিন অধ্যবসায় ও ফসলের নেশা দেখেছিল পীতেম- ''পীতেম লক্ষ্য করেছিল পরতাপের ভিতরে সেই বিচিত্র নেশার জন্ম হয়েছে, যার কথা লক্ষ্মণ সোরেন তাকে বলেছিল। ধানের গাছ যখন গামর হয়, কলার গাছে যখন মোচা আসে, সবজিতে যখন ফুল আসে, পীতেম লক্ষ করে পরতাপের ভাবভঙ্গি অন্যরকম হয়ে যায়, যেন একটা ঘোরের মধ্যে থাকে সে।''[৬২] শুধু পরতাপ বা পীতেমের নাতি জামির নয়, লক্ষ্মণ সোরেনের বলা ফসলের নেশা লেগেছিল পীতেমেরও। পীতেমের মধ্যে পরতাপ ও জামিরের চাষের পারদর্শিতা একধরনের স্বস্তি দিয়েছিল, স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হতে দেখার স্বস্তি। জামিলাবাদ-নমনকুড়িতে জমির ব্যবস্থা পাবার আগে পীতেমের বাজিকরদল অস্থায়ী ছাউনি করেছিল মালদায়, রাজমহল থেকে পালিয়ে এসে। রাজমহলে সাঁওতাল বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল বাজিকররা। একদিকে ব্রিটিশ শক্তি বাজিকর যুবকদের ধরে নিয়ে গেছিল ইংরেজদের হয়ে লড়াই করতে, অন্যদিকে সাঁওতালদের সঙ্গে সখ্যে সাঁওতালদের হয়ে লড়াই করেছিল জিল্লু, পরতাপ, পিয়ারবক্স, ধন্দু ও বালি। পরবর্তীকালে বন্দুকের গুলিতে মারা গিয়েছিল ধন্দু বাজিকর। দারোগার অত্যাচার ও বিদ্রোহের ফল আন্দাজ করেই রাজমহল ছেড়ে মালদায় চলে এসেছিল বাজিকররা। সেখানে দেখেছিল সিদু-কানুর মৃত্যুপরবর্তী ছিন্নমূল সাঁওতালদের গঙ্গা পার করে আড়কাঠিরা নিয়ে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে। শুধু তাই নয়, রেললাইন পাততে জঙ্গলের কাঠ চাই, জমি পরিষ্কার করতে লোক চাই- হাজারিবাগ, রাজমহল থেকে ছিন্নমূল কষ্টসহিষ্ণু সাঁওতালদের এইসব কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বদিউলের কাছ থেকে ব্যবস্থা পাওয়া যে জলাজমি দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিল পীতেম বাজিকরের দল, সেই জমিতে কিছু সাঁওতাল পত্তনি করেছে দেখে থেকে

যাওয়ার সাহস জোটাতে পেরেছিল। সাঁওতালদের নতুন পত্তনি নমনকুড়িতে এসে কিছু ওঁরাওরাও আলাদা পাড়া তৈরি করে বসত করেছিল। তারপর এসেছিল বাজিকররা। "নমনকুড়িতে ঘর বাঁধার মতো প্রশস্ত জায়গা এখন কিছু অবশ্যই বাড়তি হয়েছে। বাজিকরদের সমর্থ পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা সাঁওতালদের কাছ থেকে ধার করে কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে অচিরে মাটি কাটতে শুরু করে। সাঁওতাল, ওঁরাওরা তাদের জোগায় সাহস আর পরামর্শ। নতুন ভিটায় মাটি পড়তে থাকে ঝপাঝপ।"[৬৩] সাঁওতালদের কাছ থেকে চাষের কাজ আগেই শিখেছিল পরতাপ, এখানে সেই শিক্ষাকে সে কাজে লাগাল। নমনকুড়িতে বেশ ক'বছর চাষাবাদ ও পশুপালনের মধ্যে থাকার পর দেখা গেল নমনকুড়ির জমি আবার বর্ষায় ডুবল। সাঁওতাল ও ওঁরাওরা জমি উদ্ধারের আশায় থেকে গেলেও বাজিকররা থাকল না। যদিও সে জমি উদ্ধার হয়নি, সাঁওতাল ওঁরাওরা ছিটকে গিয়েছিল বিভিন্ন দিকে, চাষি থেকে কেউ কেউ চাকর হয়ে গেছিল। জামিরের নেতৃত্বে বাজিকররা সেখান থেকে সরে এল আরও পূর্বের দিকে, রাজশাহী শহরের বাইরে পদ্মার ধারে। জমি ও ফসলের আকাঙ্ক্ষায় জামিরের স্মৃতিতে শুধু ছিল নমনকুড়ির সুদিনের ছবি। এরপর তরমুজ চাষ ও সেই সংক্রান্ত বিবাদ, মহিম চৌধুরী ও লালমিয়া প্রদত্ত পাঁচবিবির জমিতে সোনার ফসল ঘরে তোলার আগেই জমি হস্তান্তরিত হয়ে যাওয়া, ফসল নষ্ট করার জন্য জামিরের ছেলে রূপার হাতে হওয়া খুন ইত্যাদি বাজিকরদের আবার জমিহীন, ভিটেহীন করে। শুধু তাই নয়, "দুই কুঠিবাড়ির দুই হাতি বাজিকরের ঘর ভাঙে। ভাদুই ফসলের জমিগুলোকে দাপিয়ে কাদা করে। ঘরে আগুন লাগে। বাজিকর রমণীরা বয়স নির্বিশেষে ধর্ষিতা হয়। ইয়াসিনের মেয়ে পলবি নিখোঁজ হয়।"[৬৪] বাজিকররা মোহর হাটখোলায় পালিয়ে আসে। দেশ স্বাধীন হয়। দেশ ভাগ হয়। সেদিন পাঁচবিবিতে বাজিকরদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার কারণ অনুসন্ধান করলে বোঝা যাবে যেহেতু বাজিকররা হিন্দু বা মুসলমান কোনও সম্প্রদায়ভুক্তই নয়, তাদের ধর্ম নেই,

সমাজের জোর নেই; অথচ মহিমবাবু বা লালমিয়ার কাছে ধর্মের প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং দ্বিতীয়ত চারিদিকের তেভাগা আন্দোলন, আধিয়ার দাবি। এরপর নানা কারণে ধর্মের, ধর্মগত সম্প্রদায়গত আশ্রয়ের প্রয়োজন অনুভব করে বাজিকররা। রূপা সাপ খেলা দেখিয়ে বিষহরির গান গেয়ে হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে প্রায় হিন্দু হয়ে যায়, হিন্দু আচার পালন করে। কিছুজন কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। জামিরের নাতি ও রূপার ছেলে শারিবা শুধু বাজিকর থেকে যায়। মুসলমান হয়ে যাওয়া বাজিকরদের মুসলমান হয়েও অবস্থা ফেরে না, মুসলমান সমাজ তাদের পরিপূর্ণ গ্রহণ করে না, তারা বাজিকরই থেকে যায়। শারিবা শহরে কাজ নেয়। গাড়ি মেকানিকের কাজ শেখে সে। এইভাবে বাজিকর পেশা ও সমাজ – দুইয়েরই ভাঙন চলে। উপন্যাসে দেখি স্থিতির সংগ্রামে তারা হারায় অনেক কিছু, অনেক প্রিয়জনকে। শেষে শারিবার হিন্দু মেয়ে মালতীর সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে ছয় পুরুষের সংগ্রামের ইতি টেনে স্বাধীন ভারতে, ভোটের দেশে বাজিকরদের অন্য সংগ্রামের অবকাশে উপন্যাস শেষ হয়।

"আজকাল" শারদীয়ায় ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত দেবেশ রায়ের *শিল্পায়নের প্রতিবেদন* উপন্যাসটি। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। প্রায় সংলাপবিহীন এই উপন্যাসে অগাস্টাস টোপনো মুণ্ডার নিঃসঙ্গ একক পথ হাঁটা উঠে এসেছে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ "মূষিক বর্ষ" অংশে মানুষের মাটির অধিকার চলে যাওয়ার দুঃখ প্রকাশিত। কোনো এক চেংতাম নামের বাঁশ যার ফুল পঞ্চাশ বছর পর পর ফোটে বা মাওতাম নামের বাঁশ যার ফুল আঠারো বছর পর পর ফোটে, সেই চেংতাম বা মাওতাম বছরে ইঁদুর ও পোকামাকড়ের বৃদ্ধি বহুগুণ বেড়ে যায়। অরণ্যের মানুষও সেই ফুল ফোটার গন্ধ পায় না, শুধু পোকামাকড় বা ইঁদুর দেখে আশঙ্কা করে সেই চেংতাম বা মাওতাম বছর শুরুর। অরণ্যের ওপর নির্ভর করে থাকা মানুষ গাছের কাণ্ড, ফল থেকে খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে

দেখে- "গাছের ফলে রস শুকিয়ে যায়, মাস শুকিয়ে যায়, শুধু শুকনো বীজ থাকে, সে বীজ মাটিতে পুঁতলে কোনো অঙ্কুর বেরয় না। ...মানুষ শাকের মত খাদ্য জোগাড় করে কত জঙলা গাছ থেকে। মাওতাম বা চেংতাম-বছরে সেই জঙলা গাছের জঙলা পাতা শুকিয়ে গাছের শীর্ণ কাণ্ডে ঝুলে থাকে, সেই কাণ্ডে এক ফোঁটা রস নেই। মানুষ মাটি খুঁড়ে কত খাদ্য সংগ্রহ করে- আলু, মেটে আলু, মিষ্টি আলু, কচু, কত রকমের শিকড়। ইঁদুররা মাটি চষে দিয়ে যায়, তা থেকে মানুষের কোনো খাদ্য আর সংগৃহীত হয় না। মানুষ মাটি চাষ করে ধান বোনে, গম বোনে, আরো কত রকমের গাছ বোনে, যাতে তার মোটা খাদ্যটি সে বহুল পরিমাণে তৈরি করে নিতে পারে। চেংতাম বা মাওতাম – বছরে পোকামাকড় আর ইঁদুর এই ধানগাছ আর গমগাছের শিকড় কেটে দিয়ে যায়, সে-গাছগুলো আর মাটি থেকে রস নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে না।"[৬৫] ফলে এই বছরগুলোতে মানুষের খাদ্যে টান পড়ে। অরণ্যের মানুষের ধারণার এই চেংতাম বা মাওতাম বছর কখন শুরু হয় বা কখন শেষ হবে তা তারা বোঝে না। এই বছরের মধ্যে ভেঙে পড়ে পারিবারিক জীবন, সমাজ। ভেঙে যায় গ্রাম। কেউ কেউ চলে যায়, কেউ কেউ থেকে যায় এই বিশ্বাসে যে এই বছর একদিন শেষ হবে। চেংতাম বা মাওতাম বছরের আগের গন্ধ আবার ফিরে এলে বোঝে মূষিক বর্ষের অবসান ঘটেছে। এই প্রত্যাবর্তন উপকথায় থাকে, থাকে বলেই মানুষ বেঁচে থাকার সাহস পায়। তবে এই উপন্যাসের মূল কাহিনির বছর ও চরিত্র এই মূষিক বর্ষের মতো কোনো এক বিপন্ন সময়ের মধ্যে অবস্থান করে। তাই তার মধ্যে ঔপন্যাসিক প্রত্যাবর্তনের জন্য আর্তনাদ দেখিয়েছেন, কোনো আশ্বাস দেননি। উপকথার ইঁদুর নয়, ইঁদুরের মতো অন্য কেউ বা মানুষ নিয়ে নিয়েছে এই অরণ্যনির্ভর মানুষদের মাটি, খাদ্যের অধিকার। চেংতাম বা মাওতাম বছরের মতো মানুষ হারিয়ে ফেলেছে জন্মভূমির ওপর অধিকার- "মানুষ ত কোনো একটা জায়গায় জন্মায়, তাই তাঁর একটা জন্মভূমি থাকে। সে যদি কোনো

গাছতলাও হয়, তা হলে সেই গাছের শিকড় যে-মাটিতে প্রোথিত সেটা তার জন্মভূমির মাটি। একটা বার্ষিক গতির মাঝখানে মানুষ আবিষ্কার করে, তার আর-কোনো জন্মভূমি নেই। সেই জন্মভূমিহীন মানুষ তার বাতাসের অধিকার হারায়, তার জলের অধিকার হারায়, তার মাটির অধিকার হারায়। মানুষের জন্মভূমি কি তার প্রেতভূমি হয়ে যায়? সেই প্রেতভূমিতে মানুষকে কি শুধু তার অধিকারহীনতা নিয়ে বেঁচে থাকার দায় পোয়াতে হয়? এই অধিকারহীনতা বিস্তারিত হয়ে যায় খাদ্যে, পানীয়ে, বাতাসে।"[৬৬] এই অধিকারহীনতা যেন শ্বাসের ওপর, তৃষ্ণার ওপরই অধিকার হারানো। উপন্যাসের মূল ভাবনায় এই জমি-জঙ্গল-জন্মভূমির অধিকার হারানোর ব্যথাই অনুরণিত হয়েছে।

চারটে পরিচ্ছেদ সম্বলিত স্বল্পায়তনের এই উপন্যাসের বাকি তিনটি পরিচ্ছেদের নাম যথাক্রমে "বাগানে", "হাটে" ও "ফরেস্টে"। অগাস্টাসকে ঘিরে থাকা এই তিনটি পরিচ্ছেদের কাহিনি মিলেমিশে গেছে। ফরেস্টের আদিবাসীদের কাছে চা-গাছ অপরিচিত ছিল না। অজানা ছিল না বনের মধ্যে গজিয়ে ওঠা এই পাতা জলের সঙ্গে ফোটালে জলের রঙ পাল্টে যায় আর সেই রঙিন জল শরীরকে সতেজ করে তোলে। এই চা-পাতার খবর অগাস্টাসের কোনো পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পেয়েছিল কোনো সাহেব। এরপর ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যে ফরেস্টের মধ্যে বানিয়ে তোলা হয়েছিল চা-বাগান, ফ্যাক্টরি। তারপর ধর্মীয় আগ্রাসনে অগাস্টাসের পূর্বপুরুষকে মুণ্ডা থেকে খ্রিস্টান বানিয়ে তোলা হয়। তারা মুণ্ডাসত্তা পুরোপুরি বিসর্জন দিতে পারে না বলেই খ্রিস্টান মুণ্ডা হয়ে যায়। আমরা দেখি, অগাস্টাসের ধর্মবোধে চাঁদ বোঙ্গা, মারাং বুরু ও প্রভু যিশু সহাবস্থান করেন। অবশ্য ঈশ্বরের সেই অস্তিত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ঘোরাফেরা করে আজন্ম দেখা, বেড়ে ওঠা অরণ্য ও চা-বাগান ঘিরে। "সে বিশ্বাস করে– চাঁদ বোঙ্গা, মারাং বুরু এই পৃথিবী বানিয়েছেন। এই পৃথিবীর মধ্যে সূর্য, চন্দ্র, নদী, ফরেস্ট, এই চা-বাগান, ভূটান পাহাড়, ধওলা নদী, ডাঙির মাঠ, ভূটানের দিকে যাওয়ার রাস্তা, হাতির পাল,

গনেশ হাতি, বাস, ট্রাক, রেলগাড়ি, ভূটান পাহাড়ের মাথার মেঘ, শালগাছের শাদা ফুল, পলাশগাছের লাল ফুল- এই সব আছে।”[৬৭] আবার প্রভু যিশুতে বিশ্বাস রাখা অগাস্টাস এও বিশ্বাস করে সেই সূর্য, চন্দ্র, সকাল, সন্ধ্যা, ফ্যাক্টরির ভাঙা ঘর, শেড, ইলেক্ট্রিকের বাতি আর চা-বাগানের অন্ধকার, কলের জল, বৃষ্টির জল, বনের শালগাছ, তাদের তির-ধনুক, হাঁড়িয়া, নতুন তৈরি হওয়া পথ, ভুটান পাহাড়ের গায়ে মেঘের মতো জঙ্গল, সেই জঙ্গলের সঙ্গে গায়ের রঙ মিশিয়ে হাতির পালের মাটিতে নেমে আসা, শালবনের মাথায় ফুলের জেগে ওঠা – সবই ঘটে প্রভু যিশু খ্রিস্টের ক্ষমায় ও দয়ায়। পাদ্রী কর্তৃক অন্যধর্মকে ছোটো করে খ্রিস্টধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রচারের সংকীর্ণতার ওপর আঘাত অবশ্যই সাধারণ এক চা-বাগানের চৌকিদারের মননে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যখন ধর্মীয় সংকীর্ণতার ওপরে কেবল সৃষ্টিকর্তারূপে- যেখানে চাঁদ বোঙ্গা বা মারাং বুরুর সঙ্গে প্রভু যিশুর কোনও বিরোধ নেই। ফরেস্টের মধ্যে গজিয়ে ওঠা চা-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বৃহৎ চা-শিল্প, অরণ্যের ওপর নির্ভর করে থাকা মানুষগুলো চা-বাগানের মজুর হয়ে যায়। তারপরে একদিন সেই চা-বাগান উঠে যায়। অগাস্টাস বোঝে না মণ মণ চা তৈরি সত্ত্বেও কীভাবে চা-বাগান ব্যবসায় ক্ষতি হয়, বোঝে না চা-বাগানটা দিব্যি থাকা সত্ত্বেও তা উঠে যায় কী করে! ধীরে ধীরে বোঝে মানুষের রয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়ার মধ্যেই চা-বাগানের থাকা বা উঠে যাওয়া জড়িয়ে। মনুষ্যশূন্য চা-বাগানে বাবুলাইনের দরজায় লতা বেড়ে ওঠে, কুলিদের ঘরের চালা ভেঙে পড়ে। অগাস্টাসের মনে হয়- “...কুলিরা বোধহয় দাঁড়িয়ে মাথার ওপর হাত তুলে চালাগুলোকে খাড়া রাখত, মানুষগুলোই যেন খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। মানুষগুলো চলে যেতেই পুরো কুলিলাইন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এই কাঁচা রাস্তা, এই বাড়িঘর- এ-সব কি রাস্তা হয়ে এগিয়ে যেত বা ঘর হয়ে খাড়া থাকত মানুষের পায়ের আওয়াজে? কত মানুষ এই রাস্তা দিয়ে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-রাত্রি এই সব ঘরে যাতায়াত করত। আর সেই পায়ের আওয়াজে, মানুষের গলার

আওয়াজে রাস্তা সাফা থাকত, ঘরবাড়ি সিধে থাকত। সেই আওয়াজ ধীরে-ধীরে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি থেমে যেতেই এই রাস্তা আর রাস্তা নেই, এই ঘরবাড়ি আর ঘরবাড়ি নেই।"[৬৮] উপন্যাসে শিল্প গড়ে ওঠাকে কেন্দ্র করে নেমে আসা আদিবাসীদের ওপর ধর্মীয় আগ্রাসন ও শিল্প বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী কুলিদের ওপর নেমে আসা আর্থিক সংকট পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও পরিবর্তনের অভিঘাত নিয়ে আসে। অগাস্টাস টোপনো মুণ্ডার বউ এঞ্জেলা ও ছেলেরা চা-বাগান বন্ধ হলে সেখান থেকে চলে যায়। অগাস্টাস জানে না তারা কোথায় গেছে। অগাস্টাস বাগান ছেড়ে যেতে চাইনি বলে তারা তাকে ছেড়েই চলে গেছে, বাঁচার তাগিদে চলে গেছে। পরিবার ভেঙে গেছে অগাস্টাসের। চা-বাগান বন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মজুর শোষণের প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। প্রভিডেন্টের টাকা ও কিছু নগদ টাকা দিয়ে দেওয়া হয় কুলিকামিনদের। সেই টাকা পাকাপাকি চাকরি চলে যাওয়ার ক্ষতিপূরণের থেকে অনেক কম। শুধু তাই নয়, আদিবাসী মজুরদের হাতের টাকা লুঠ করে নেওয়ার জন্য মদের দোকান বসে, মুরগির লড়াই চলে, মাদল বাজে। তারপর টাকা ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাদলের সুরও মিলিয়ে যায়- "বাগান উঠে যাওয়ার পরে ভবিষ্যৎচিন্তাহীন সেই শেষ কটি দিনে ছিল শুধু মদ, শুধু টাকার হাতবদল, শুধু নাচ আর গান। তারপর একদিন ত মেলা ভেঙেছে। যখন মেলা চলার আর দরকার নেই, তখনই মেলা ভেঙেছে।"[৬৯] চা-বাগানের মজুর হয়ে যাওয়ার পরেও আদিবাসীদের সঙ্গে অরণ্যের কোথাও একটা নিবিড় যোগ থেকে যায়। চা-বাগান একেবারে ফরেস্ট থেকে আলাদা হওয়ার আগে পর্যন্ত বাগানের মানুষ ও অরণ্যের জানোয়ার মধ্যে একটা ভাবের যোগ ছিল। চিতাবাঘ সন্তান প্রসব করতে চলে আসত চা-বাগানে, কারণ চা-বাগানের নিরাপদ ঝোপের মধ্যে সদ্যজাতদের রেখে বাঘিনী খাবারের খোঁজে নিশ্চিন্তে যেতে পারত। চিতা যেমন মানুষের গন্ধ পেত, তেমনই অগাস্টাস পেত প্রসব করতে আসা বাঘিনীর গন্ধ। তারপর সমস্ত বাগান তাদের রক্ষা

করতে লেগে পড়ত- "প্রসবের পর বাচ্চা দিয়ে বাঘিনী যাতে নিরাপদে থাকে, সেজন্যে, পুরোটা চা-বাগান, তার সব লোকজন, তার নদী-নালা-হাওয়া সব সব কিছু বাঘিনী আর তার বাচ্চাকে ঘিরে রাখে।"[৭০] চা-বাগানের মজুর, অগাস্টাস, ম্যানেজারবাবু সকলেই আগলে রাখে চিতাশাবককে যতদিন না সে তার মায়ের তত্ত্বাবধানে গড়াতে, লাফাতে, শিকার ধরতে শেখে। একদিন চিতার বাচ্চা চুরির একটা ঘটনা ও সেই খবরের জেরে এক সরকারি নির্দেশিকায় বাগান আর ফরেস্টের এই নিবিড় আত্মীয়তা আর থাকে না। বাগান ফরেস্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে একাই বেড়ে উঠতে থাকে। বাগানের সঙ্গে ফরেস্টের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হলেও অগাস্টাস তার আদিবাসী সত্তায় অরণ্যের সঙ্গে, শালবনের সঙ্গে আত্মিকতাকে ছিন্ন করেনি, বরং বিশ্বাস করেছে- "টোপনো শুধু জেনে রেখে দেয়, আছে, ফরেস্ট আছে। সেখানে শালবনে যখন শালফুল ফোটে তখন গন্ধে মাতাল হয়ে যেতে হয়।...সেই শালবনে টোপনো পারলে একটা শক্ত বাঁশ হয়ে বাঁচবে, পারলে কোনো গাছের গায়ে লাউ হয়ে ঝুলবে। ফরেস্টের টোপনো-বাঁশ বা লাউ।"[৭১] কোনো মহান বা শ্রেষ্ঠ খ্রিস্টধর্ম টোপনো মুণ্ডার অস্তিত্ব থেকে অরণ্যকে, আদিবাসী মুণ্ডা সত্তাকে উপড়ে ফেলতে পারেনি। বাগানকে ভালোবেসেও, জীবনের অনেকটা সময় দিয়েও অগাস্টাস তাকে ধরে রাখতে পারেনি, বাগান উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেছে প্রিয়জনেদের, চেনা চারপাশকে। নির্জন বাগান ক্রমেই দুঃসহ নিঃসঙ্গ করেছে অগাস্টাসকে। তাই শেষে সে ফিরে যেতে চেয়েছে চিরকালের আশ্রয় অরণ্যে, শালবনে- যে শালবনের অস্তিত্ব জড়িয়ে রয়েছে তাদের উপকথায়। শালগাছ তথা শালবনের সঙ্গে আদিবাসীদের এক গভীর আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মজনের মতোই শালবন আশ্রয়, আবরণ, খাদ্য দেয়। আত্মরক্ষার অস্ত্র দেয়। কিন্তু সরকারের কাছে ইউক্যালিপটাস গাছ শালগাছের চেয়ে লাভজনক। তাই অগাস্টাস যে অরণ্যে ফেরে তা তার চেনা শালবন নয়, ইউক্যালিপটাসের জঙ্গল। সে অরণ্য তাই অগাস্টাসের হয়ে ওঠে না।

প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় না টোপনোর- "টোপনো সেই শেষ রাত ও সূর্যোদয় জুড়ে এইটুকুই শুধু জানল, তার আর কোনো ফরেস্ট নেই।"[৭২] টোপনো সেই মূষিক বর্ষে ঢুকে যায় যেখানে তাদের অস্তিত্ব কীভাবে টিকে থাকবে, তা কেউ জানে না। এক টুকরো জমির অধিকারও অগাস্টাসরা পায় না, চেনা অরণ্যও লুঠ হয়ে যায়। মহাশ্বেতা দেবী বলেছিলেন- "উত্তরবঙ্গে অঢেল আদিবাসী জমি রূপান্তরিত হচ্ছে চা-বাগান ও ফলবাগিচায়।"[৭৩] তারপর সেই চা-বাগানও বন্ধ হয়ে গেলে তারা ফিরে পায় না হারানো জমি, পায় না অরণ্য। এক চূড়ান্ত অপরিণামদর্শী সরকারি সিদ্ধান্তে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ওপর নেমে আসে চরম আর্থিক সংকট, যার অভিঘাত ভেঙে দেয় সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন।

ত্রিপুরার লংতরাই অঞ্চলের পাহাড়ি আদিবাসীদের জীবিকার লড়াইকে তুলে ধরেছেন নৃপেন চক্রবর্তী *লংতরাই আমার ঘর* (১৯৯৬)-এ। সাহিত্যিক এটাকে "বড়োগল্প" বলে দাবি করলেও স্বল্পায়তন উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এতে লক্ষ করা যায়। দেশভাগের পরে বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু বাঙালিতে ত্রিপুরায় কলোনি গড়ে তোলার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে কাহিনির সূচনা। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এই কলোনি গড়ে তোলার কাজ চলে এবং বাদলের সূত্র ধরে পাহাড়ি আদিবাসীদের সংবৎসর নিদারুণ আর্থিক সংগ্রামের পরিচয় দেন লেখক। সামান্য জমি তারা "জুম" চাষ করে, কিন্তু চাষের জন্য যে জলের প্রয়োজন, সেই জলের তীব্র সংকট রয়েছে- "চাষ করতে গেলে তো জল ছাড়া চলে না। চৈত্র মাসে এখানে আমাদের ত্রিশ হাত কুয়োতেও জল থাকে না। ঐ যে পাহাড়ী ছড়া দেখছো বটগাছের তলায়, ওটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে দু'মাস পড়ে।"[৭৪] বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু বাঙালিদের জমি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের জুম কাটার সংকট তৈরি হয়। ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজের যে পরিচয় পাই, তা এমন- "ত্রিপুরার আদি মানবকুল মঙ্গোলীয় তথা টিবোটো বর্মণ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জাতি। এই আদিম মানব সম্প্রদায় তথা উপজাতিবর্গ ভারতের হিমালয়ের পাদদেশে এবং

উত্তরপূর্ব-সীমান্ত অঞ্চল সংলগ্ন ভূমিতে বসবাস করত। মুখ্যত ত্রিপুরার আদি-উপজাতি মানবকুল মোট দশভাগে বিভক্ত। এই দশ সম্প্রদায়ের লোকই আজ এই রাজ্যে সংখ্যায় অধিক। তন্মধ্যে ত্রিপুরী বা ত্রিপুরা, রিয়াং, জমাতিয়া এবং নোয়াতিয়া এই চারটি উপজাতি সম্প্রদায়ই ছিল আদি এবং প্রধান।"[৭৫] এছাড়াও কুকি, হালাম, মগ, চাকমা, গারো প্রভৃতি আরও যে যে আদিবাসীদের সন্ধান পাওয়া যায়, তারা বাইরে থেকে আগত। পূর্ববর্তী স্থানে জুম চাষের সমস্যা হওয়ায় ক্ষেপংরায়ের নেতৃত্বে পাহাড়ি আদিবাসীরা আরও গভীর জঙ্গলে চলে যায় জুম চাষ করার জন্য। এদের সংস্কৃতির একটা পরিচয় যেমন পাওয়া যায় "জামাই ওঠা" প্রথা, যেখানে বিয়ের পর নববিবাহিত যুবককে শ্বশুরবাড়িতে বছর দুই-চার থেকে সব কাজ করতে হয়, তেমনই "টংঘর" তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। ছন বাঁশ দিয়ে তৈরি পাহাড়ের ওপর ঘরই "টংঘর", যেখানে জুমের ফসল জমা রাখা হয় বিক্রির আগে। ক্ষেপেংরায়ের নেতৃত্বে নতুন স্থানে জুম ভালো হয়। তারা প্রথমে ধান, তারপর তিল এবং শেষে কার্পাস চাষ করে। চাষের পাশাপাশি পাহাড়ি মহিলারা পাহাড়ি তাঁতে কাপড় বোনে। কিন্তু ধীরে ধীরে জঙ্গলকে সরকার "রিজার্ভ" ঘোষণা করলে এই পাহাড়ি আদিবাসীদের জুমের পরিসর কমে। সরকারি পরিকল্পনায় তাদের নামিয়ে আনা হয় কলোনিতে। ফলের বাগানে কাজ বা চাষ করার জন্য বলদ দেওয়া হয়। দেখা যায়, জুম চাষ বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে পাথর কাটা বা অন্য পেশায় চলে যেতে থাকে পাহাড়িরা। তাদের আর্থিক পরিবর্তন তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ডেকে আনে। সেই জঙ্গলের বাঁশ ইজারাদারের হাতে, টংঘর করার জন্য কাটা বাঁশও চালান হয়ে যাচ্ছে জেনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পাহাড়িরা। সরকার গুলি চালায়। পাহাড়ি আদিবাসীদের জীবন-জীবিকার লড়াই এই রচনায় বলিষ্ঠভাবে ধরা দিয়েছে।

অনিল ঘড়াইয়ের *দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান* (১৯৯৭) আসলে দৌড়বোগাড়ার তীরে বসবাসকারী মানুষজনেদের দৌড়বোগাড়ানির্ভর আর্থজীবন এবং সেই জীবনে ভাঙনের আভাস। দৌড়বোগাড়া নদী নয়, নালা। শীতের সময় নালায় জল একেবারে কমে যায়, নালার চওড়া দাঁড়ায় দশ পনেরো হাত। আবার বর্ষায় সেই নালা কানায় কানায় ভরে ওঠে, ঔপন্যাসিক বললেন, "দৌড়বোগাড়া তখন দৌড়বোগাড়া নালা নয়, ফুলে ফেঁপে ওঠা নদী। কী তার গর্জন, লম্ফঝম্প!"[৭৬] এই দৌড়বোগাড়ায় সোনা খুঁজতে আসে হীরালাল বুড়ো ও আরও অনেকে। হীরালাল বুড়ো জায়গা দেখিয়ে দিলে বাকিরা সেখানে সোনা খোঁজে। ওই অঞ্চলজুড়ে মানুষ জানে দৌড়বোগাড়ার বুকে হাঁটুমুড়ে কাঠের পাটাতনে বালি ধুলে সোনার রেণু পাওয়া যায়। কবে থেকে পাওয়া যায়, সে কথা বৃদ্ধ হীরালালও জানে না। মুখে মুখে গল্পকথা গড়ে ওঠে। হীরালালের বাবার সঙ্গে দৌড়বোগাড়ায় সোনার রেণু তোলার শুরু যে শৈশবে, যত বয়স বেড়েছে দৌড়বোগাড়ার নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। সংসার, সংসারের দারিদ্র্য, স্ত্রী গুরুবারির তীক্ষ্ণ শ্লেষ – কিছুই হীরালালকে দৌড়বোগাড়া থেকে আলাদা করতে পারে না। তবে দৌড়বোগাড়ার প্রতি হীরালালের এই আকর্ষণ স্রেফ সোনার নয়, মাটির। দৌড়বোগাড়া ছাড়া সেই অঞ্চলের মানুষদের জীবিকার অন্য পথ প্রায় নেই বললেই চলে। অবশ্য সোনার কণা বেচে মহাজন জনার্দন ফুলে ফেঁপে উঠলেও ভুন্ডে, রাউতু, রান্‌ধো, তমসয়দের সংসার ভালোভাবে চলে না। জঙ্গলে কাঠ কাটার অধিকার নেই। কিন্তু ধীরে ধীরে দৌড়বোগড়ায় সোনারকুচির পরিমাণ কমেছে। রাউতুরা বর্ষাকালে ধান রোয়ার কাজ করত আর বাকি বছরজুড়ে দৌড়বোগড়ার বুক আঁচড়ে সোনা খোঁজার। কিন্তু সোনা কম পাওয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক আর্থিক সংকটের আভাস ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত উপন্যাসের শেষে পাওয়া যায়।

আরণ্যক বা সহজ সরল কৌম জীবন থেকে বিশ্বায়ন পরবর্তী ভারতে প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থিক জীবন নানা অভিঘাত ও পালাবদলের মধ্যে দিয়ে গেছে। অরণ্যের অধিকার কখনও কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কখনও অরণ্য ক্রমেই ছোটো হয়েছে নগরায়ণের কারণে। কৃষিজমি প্রসারণ সঙ্গে অরণ্যের অস্তিত্বের সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক। অরণ্যের সংকট অরণ্যনির্ভর জনগোষ্ঠীর ওপর প্রথম অর্থনৈতিক আঘাত। দ্বিতীয় অভিঘাত কৃষিজমির দখল। নানাবিধ শোষণে জমি বেদখল হয়ে গেছে, শুধু তাই নয় শিল্পায়ন ও উন্নয়নের জোয়ার যা কিনা নগরায়ণেরই অংশ, গ্রাস করেছে সামান্যতম জমিও। নগরের আলোয় নীচের অন্ধকারের মতো দারিদ্র্য থেকে দারিদ্র্যতম অবস্থায় পৌঁছে গেছে আদিবাসীদের আর্থিক অবস্থান। টিকে থাকতে খুঁজে নিয়েছে বিকল্প জীবিকা। বিস্তৃত সময়পর্বে তাদের আর্থ-সামাজিক পরিসীমায় দেখা গেছে আড়কাঠির দ্বারা প্রতারিত হয়ে হোক বা স্বেচ্ছায় তারা খাদানের বা চা-বাগানের মজুর হয়ে গেছে কিংবা হয়ে গেছে পরিযায়ী শ্রমিক। বিশ্বায়নের জেরে নতুন করে আর্থ-সামাজিক পালাবদলের মুখোমুখি হয়েছে। শিক্ষার প্রসারণের ফলে শিক্ষিত আদিবাসীরা খুঁজে নিয়েছে অন্য কোনো পেশা যা তাদের উন্নত আর্থ-সামাজিক অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে, কিন্তু তবু বলা যায় এই অবস্থানের পরিবর্তন ব্যষ্টিক গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, সমষ্টির হয়ে ওঠেনি। বাংলা ভাষার সাহিত্যিকরা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থজীবনের এই নানা পর্যায় ও পালাবদলকে যেভাবে উপন্যাসে ধরেছেন, তাতে তাদের দীর্ঘ আর্থ-সামাজিক জীবনের একটা গ্রাফ পাঠকের কাছে পৌঁছে যায়। তাদের সংকটের ইতিবৃত্তের বাস্তবতা রক্ত-মাংসের মানুষের জীবনের কাহিনির পথ বেয়ে নির্মাণ করে বিকল্প ইতিহাসের।

তথ্যসূত্র :

১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘‘আরণ্যক’’, *অরণ্যসমগ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,* চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল সম্পাদিত, গাঙচিল, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২১৩

২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘‘আরণ্যক’’, *অরণ্যসমগ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,* চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল সম্পাদিত, গাঙচিল, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২১০

৩। Sarat Chandra Roy, *The Mundas and Their Country*, The City Book Society, Calcutta, 1912, p- 385

৪। Sarat Chandra Roy, *The Mundas and Their Country*, The City Book Society, Calcutta, 1912, p- 386

৫। রমাপদ চৌধুরী, ‘‘অরণ্য আদিম’’, *রমাপদ চৌধুরী দশটি উপন্যাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা- ৩৪১

৬। রমাপদ চৌধুরী, ‘‘অরণ্য আদিম’’, *রমাপদ চৌধুরী দশটি উপন্যাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা- ৩৬৩

৭। রমাপদ চৌধুরী, ‘‘অরণ্য আদিম’’, *রমাপদ চৌধুরী দশটি উপন্যাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা-৩৮৭

৮। রমাপদ চৌধুরী, ‘‘অরণ্য আদিম’’, *রমাপদ চৌধুরী দশটি উপন্যাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা- ৩৬৭

৯। রমাপদ চৌধুরী, ‘‘অরণ্য আদিম’’, *রমাপদ চৌধুরী দশটি উপন্যাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা- ৩৯০

১০। রমাপদ চৌধুরী, ‘‘অরণ্য আদিম’’, *রমাপদ চৌধুরী দশটি উপন্যাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা- ৪০৫

১১। শ্রী কালীপদ ঘটক, *অরণ্য-কুহেলী,* পূর্ণবঙ্গ প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রথম মুদ্রণ, মহালয়া ১৩৫৬, পৃষ্ঠা- ভূমিকা

১২। শ্রী কালীপদ ঘটক, *অরণ্য-কুহেলী,* পূর্ণবঙ্গ প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রথম মুদ্রণ, মহালয়া ১৩৫৬, পৃষ্ঠা- ৮৬

১৩। শ্রী কালীপদ ঘটক, *অরণ্য-কুহেলী,* পূর্ণবঙ্গ প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রথম মুদ্রণ, মহালয়া ১৩৫৬, পৃষ্ঠা- ৮৭

১৪। শ্রী কালীপদ ঘটক, *অরণ্য-কুহেলী,* পূর্ণবঙ্গ প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রথম মুদ্রণ, মহালয়া ১৩৫৬, পৃষ্ঠা- ২৮৮

১৫। সুবোধ ঘোষ, ‘‘শতকিয়া’’, *সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র ৩,* উত্তম ঘোষ ও সমীর কুমার নাথ সম্পাদিত, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১১৮

১৬। সুবোধ ঘোষ, ‘‘শতকিয়া’’, *সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র ৩,* উত্তম ঘোষ ও সমীর কুমার নাথ সম্পাদিত, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১১৮

১৭। সুবোধ ঘোষ, ‘‘শতকিয়া’’, *সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র ৩,* উত্তম ঘোষ ও সমীর কুমার নাথ সম্পাদিত, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ২৮৬

১৮। সুবোধ ঘোষ, ‘‘শতকিয়া’’, *সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র ৩,* উত্তম ঘোষ ও সমীর কুমার নাথ সম্পাদিত, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ২৭৪

১৯। সুবোধ ঘোষ, ‘‘শতকিয়া’’, *সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র ৩,* উত্তম ঘোষ ও সমীর কুমার নাথ সম্পাদিত, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ২৭২-২৭৩

২০। সুবোধ ঘোষ, ‘‘শতকিয়া’’, *সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র ৩,* উত্তম ঘোষ ও সমীর কুমার নাথ সম্পাদিত, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ২৭৩

২১। সুবোধ ঘোষ, ‘‘শতকিয়া’’, *সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র ৩,* উত্তম ঘোষ ও সমীর কুমার নাথ সম্পাদিত, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৩৪৪-৩৪৫

২২। সুবোধ ঘোষ, ‘‘শতকিয়া’’, *সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র ৩,* উত্তম ঘোষ ও সমীর কুমার নাথ সম্পাদিত, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ২৭৩

২৩। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড,* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৭৭

২৪। সুবোধ ঘোষ, ‘‘শতকিয়া’’, *সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র ৩,* উত্তম ঘোষ ও সমীর কুমার নাথ সম্পাদিত, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১৩৯

২৫। সুবোধ ঘোষ, ‘‘শতকিয়া’’, *সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র ৩,* উত্তম ঘোষ ও সমীর কুমার নাথ সম্পাদিত, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৩৬৭

২৬। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা- ৭৯৫

২৭। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ‘‘পঞ্চতপা’’,*আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড,* গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও সর্বাণী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলিকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২০, পৃষ্ঠা- ৩

২৮। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,"পঞ্চতপা",*আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড,* গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও সর্বাণী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি, কলিকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২০, পৃষ্ঠা- ১৬

২৯। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,"পঞ্চতপা", *আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড,* গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও সর্বাণী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলিকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২০, পৃষ্ঠা- ২০

৩০। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,"পঞ্চতপা",*আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড,* গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও সর্বাণী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলিকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২০, পৃষ্ঠা- ২৫

৩১। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,"পঞ্চতপা",*আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড,* গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও সর্বাণী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলিকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২০, পৃষ্ঠা- ৯৩

৩২। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,"পঞ্চতপা",*আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড,* গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও সর্বাণী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলিকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২০, পৃষ্ঠা- ১৭০

৩৩। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,"পঞ্চতপা",*আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড,* গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও সর্বাণী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলিকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২০, পৃষ্ঠা- ২৩৬

৩৪। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "নিজের কথা", *কবিতীর্থ পত্রিকা, জন্মশতবর্ষে অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা,* জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা- ২২৮

৩৫। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "হলং মানসাই উপকথা", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৮,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা- ৫৫

৩৬। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "সোঁদাল", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৮,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা- ৮৩

৩৭। অমিয়ভূষণ মজুমদার, *মহিষকুড়ার উপকথা ও একটি খামারের গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২২-২৩

৩৮। অমিয়ভূষণ মজুমদার, *মহিষকুড়ার উপকথা ও একটি খামারের গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২২

৩৯। অমিয়ভূষণ মজুমদার, *মহিষকুড়ার উপকথা ও একটি খামারের গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৯০

৪০। অমিয়ভূষণ মজুমদার, *দুখিয়ার কুঠি,* নিও-লিট পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬, পৃষ্ঠা- ৩৯

৪১। অমিয়ভূষণ মজুমদার, *দুখিয়ার কুঠি,* নিও-লিট পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬, পৃষ্ঠা- ৪২-৪৩

৪২। অমিয়ভূষণ মজুমদার, *দুখিয়ার কুঠি,* নিও-লিট পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬, পৃষ্ঠা- ৫২-৫৩

৪৩। অমিয়ভূষণ মজুমদার, *দুখিয়ার কুঠি,* নিও-লিট পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬, পৃষ্ঠা- ১৬৩

৪৪। সমরেশ মজুমদার, "বাসভূমি", *সমরেশ মজুমদার উপন্যাস সমগ্র ২,* বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃষ্ঠা- ১০৩

৪৫। সমরেশ মজুমদার, "বাসভূমি", *সমরেশ মজুমদার উপন্যাস সমগ্র ২,* বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃষ্ঠা-১০১

৪৬। সমরেশ মজুমদার, "বাসভূমি", *সমরেশ মজুমদার উপন্যাস সমগ্র ২,* বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃষ্ঠা-১৩৯

৪৭। সমরেশ মজুমদার, "বাসভূমি", *সমরেশ মজুমদার উপন্যাস সমগ্র ২,* বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃষ্ঠা- ১৫০

৪৮। সাধন চট্টোপাধ্যায়, "উদ্যোগ পর্ব", *উপন্যাস সমগ্র ৩,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃষ্ঠা- ২৫৬

৪৯। শ্রী শরৎচন্দ্র রায়, "ছোটনাগপুরের ওঁরাও জাতি", *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা,* দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত/সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা– ৭৩

৫০। সাধন চট্টোপাধ্যায়, "উদ্যোগপর্ব", *উপন্যাস সমগ্র ৩,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃষ্ঠা- ২৮৯

৫১। সাধন চট্টোপাধ্যায়, "উদ্যোগপর্ব", *উপন্যাস সমগ্র ৩,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃষ্ঠা- ৩২৫

৫২। শ্রী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, "ওঁরাদের- 'বানগাড়ি ও খলিহান পূজা এবং নওয়াখানি", *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা,* দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত/সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা– ৮৩

৫৩। অরূপ পলমল (সম্পাদনা), *কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত,* ডাভ্ পাবলিকেশন হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৯৪

৫৪। সৈকত রক্ষিত, *আকরিক,* শিল্পসাহিত্য, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃষ্ঠা- ৯

৫৫। সৈকত রক্ষিত, *আকরিক,* শিল্পসাহিত্য, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃষ্ঠা- ২৩

৫৬। অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়,* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৭, পৃষ্ঠা- ২৬

৫৭। অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়,* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৭, পৃষ্ঠা- ২০৩

৫৮। অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়,* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৭, পৃষ্ঠা- ৬৫

৫৯। অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়,* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৭, পৃষ্ঠা- ১৬

৬০। অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়,* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৭, পৃষ্ঠা- ৭৬

৬১। অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়,* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৭, পৃষ্ঠা- ১১

৬২। অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়,* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৭, পৃষ্ঠা- ৯৬

৬৩। অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়,* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৭, পৃষ্ঠা- ৯৩

৬৪। অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়,* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৭, পৃষ্ঠা– ১৬৯

৬৫। দেবেশ রায়, *শিল্পায়নের প্রতিবেদন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ২৩-২৪

৬৬। দেবেশ রায়, *শিল্পায়নের প্রতিবেদন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ২৫

৬৭। দেবেশ রায়, *শিল্পায়নের প্রতিবেদন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৩৪

৬৮। দেবেশ রায়, *শিল্পায়নের প্রতিবেদন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৩৯-৪০

৬৯। দেবেশ রায়, *শিল্পায়নের প্রতিবেদন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৪৯

৭০। দেবেশ রায়, *শিল্পায়নের প্রতিবেদন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৮০

৭১। দেবেশ রায়, *শিল্পায়নের প্রতিবেদন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৮৪-৮৫

৭২। দেবেশ রায়, *শিল্পায়নের প্রতিবেদন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ১১২

৭৩। নির্মল ঘোষ, ''কথোপকথন : মহাশ্বেতা দেবী ও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক'', *মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১০৮

৭৪। নৃপেন চক্রবর্তী, *লংতরাই আমার ঘর,* ত্রিপুরা দর্পণ প্রকাশনী, আগরতলা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৬

৭৫। বিজয় কুমার দেববর্মণ, *ত্রিপুরার উপজাতি বিবাহবিধি ও পূজা পার্বণ,* পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৯

৭৬। অনিল ঘড়াই, *দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ৭৩